স্বাস্থ্যধর্ম্ম-যোগ

দ্বিতীয় ভাগ

(॥৴ আনা)

যোগাচার্য্য ডাঃ পি, সি, ঘোষ রায় চৌধুরী
প্রণীত

ভারত যোগ ও তন্ত্রশক্তি কার্য্যালয়
(Bharat Jog & Tantrasakti Karjyalaya)
কৃষ্ণনগর (বেঙ্গল)

উভয় খণ্ড একত্রে

মূল্য—এক টাকা দুই আনা

ভারত যোগ ও তন্ত্রশক্তি কার্য্যালয় হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
পোঃ—কৃষ্ণনগর (বেঙ্গল)

প্রিণ্টার—
শ্রীযুত সুনীলকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শ্রীপ্রেস, বরিশাল।

সূচিপত্র।

(দ্বিতীয় ভাগ)

স্বপ্নফল

—— ঃঃ ——

আমরা নিদ্রিতাবস্থায় প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন কখন কখন ফলদায়ক হইয়া থাকে। ঋষিগণ এই স্বপ্নফলও বিচার করিয়া ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক তথ্য নিরূপন করিয়া গিয়াছেন কোন্ অবস্থায় স্বপ্ন দেখা সত্য হয়, কোন্ অবস্থায় সত্য হয় না কিংবা কখন স্বপ্নের ফল ফলিবে ইত্যাদি বিষয় মোটামুটি সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করিলাম। শাস্ত্রে আছে:—চিন্তাব্যাধিযুক্ত অর্থাৎ দুশ্চিন্তা পরায়ণ ব্যক্তি যে স্বপ্ন দর্শন করে, সেই স্বপ্ন নিষ্ফল হইয়া থাকে। ভয়াকুল চিত্তে এবং নিদ্রিতাবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া গেলে কিংবা দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিলে পর স্বপ্ন দেখিলে, সেই স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। আরও, স্বপ্ন দর্শনের পর পুনরায় নিদ্রিত হইলে এবং কশ্যপগোত্র ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের বিষয় প্রকাশ করিলে সেই স্বপ্ন নিশ্চই নিষ্ফল হয়।

শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের তিথীহিসাবে দৃষ্ট স্বপ্ন সকল, নিষ্ফল হইয়া থাকে—নিম্নে প্রত্যেক তিথীতে দৃষ্ট স্বপ্নের সফলতা, নিষ্ফলতা লিপিবদ্ধ করা হইল। যথা:—

১। শুক্ল প্রতিপদের স্বপ্ন দ্রষ্টার সুখের কারণ।

২। ঐ দ্বিতীয়ার স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

৩। ঐ তৃতীয়ার স্বপ্ন সফল হয়।

৪। ঐ চতুর্থীর স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

৫। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর স্বপ্ন কিয়দংশ সফল হয়।

৬। ঐ ষষ্ঠীর স্বপ্ন সহসা সফল হওয়া অসম্ভব।

৭। ঐ সপ্তমীর স্বপ্ন গোপনে রাখিলে সিদ্ধি হয়।

৮। ঐ অষ্টমী ও নবমীর স্বপ্ন সত্বর সিদ্ধি হয়।

৯। শুক্লপক্ষের দশমী ও একাদশীর স্বপ্ন অসিদ্ধি হয়।

১০। ঐ দ্বাদশীর স্বপ্ন কদাচিৎ সফল হয়।

১১। ত্রয়োদশীর স্বপ্ন সত্বর সিদ্ধি হয়।

১২। চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমার স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধি হয়।

১৩। কৃষ্ণা পঞ্চমীর স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধি হইবে।

১৪। ঐ একাদশীর স্বপ্ন অবশ্য সিদ্ধি হইবে।

১৫। ঐ ষষ্ঠী ও দ্বাদশীর স্বপ্ন মিথ্যা হয়।

১৬। ঐ ত্রয়োদশীর স্বপ্নে মন্দফল ফলিয়া থাকে!

১৭। ঐ চতুর্দ্দশীর স্বপ্ন শুভ ফল দেয়।

তিথী হিসাবে স্বপ্নের ফলাফলগুলি আমি অনেক ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। পাঠকবর্গ এ বিষয় লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

—::—
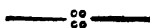
মৃত্যু ও তৎপূর্ব্বে উহা জানিবার উপায়

মৃত্যুর অবধারিত কোন সময় নাই। কাহার কখন যে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতে হইবে—তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। জন্মমৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার অর্থাৎ জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই। কাহাকে কখন যমরাজা আসিয়া গ্রাস করিবে—ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম

তবে আমরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে পারিতাম এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিতাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে কতগুলি লক্ষণ মানব শরীরে প্রকাশ পায়—এরূপ বহুবিধ লক্ষণ ঋষিরা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন। শাস্ত্রে উহা বিষদভাবে বর্ণিত আছে। তবে, ঐ লক্ষণগুলি সবগুলিই যে সকলের দেখা যায় তাহা নয়। তন্মধ্যে মাত্র ২টী লক্ষণের কথা ঋষিরা স্থির করিয়া গিয়াছেন যাহা প্রত্যেক মানবের মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখা যাইবেই। সুতরাং অন্য সবগুলি বাদদিয়া মাত্র ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দুইটীই উল্লেখ করিলাম।

১। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষুর কোণে ঈষৎ চাপিলে, যে কোণে চাপিবেন উহার বিপরীত দিকে তারার মত উজ্জ্বল চক্‌চকে একপ্রকার জ্যোতি দেখা যায়। প্রত্যেক মানবের মৃত্যুর ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ জ্যোতি লোপ্ পাইবেই অর্থাৎ মৃত্যুর ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ জ্যোতি আর দেখা যাইবে না। রাত্রিতে অন্ধকার গৃহেই ঐ জ্যোতি খুব উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখা যায়—পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

২। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাকের সমান মস্তকের উপর কিম্বা ভ্রূর উর্দ্ধে কপালের উপর বদ্ধমুষ্টি রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কব্জার নীচে সমানভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হাত খুব সরু দেখাইবে—ইহাই নিয়ম। কিন্তু মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে ঐরূপ সরু না দেখাইয়া ঐস্থান ফাঁক দেখাইবে অর্থাৎ বোধ হইবে যেন হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই, হাত হইতে মুষ্টি বিভিন্ন। মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্ব হইতেই এ লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। প্রত্যেক নরনারীরই ১নং ও ২নং লিখিত লক্ষণ ২টী মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখা দিবেই দিবে। এই ২টী

বিষয় জানা থাকিলে প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুর পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

—— ঃঃ ——

যৌবনকাল দীর্ঘস্থায়ী করিবার কৌশল

আহারাদি বিষয়ে সংযত থাকিয়া অর্থাৎ যখন তখন যা' তা' আহার না করিয়া সময়মত আবশ্যকানুযায়ী নিরামিষ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাপূর্ব্বক এই পুস্তকে উল্লিখিত ঋষিদের প্রদর্শিত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রত্যেকটী কৌশল যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে প্রতিপালনপূর্ব্বক বাল্যকাল হইতেই যিনি জীবন যাপন অভ্যাস করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যৌবনকালটী দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারিবেন। আরও ১টী নিয়ম প্রতিপালন করিতে যত্নবান হইবেন :

দিনের বেলায় বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত রাখিতে অভ্যাস করিবেন। এই প্রক্রিয়াটী চিরযৌবন লাভের অতি উৎকৃষ্ট সুকৌশল। বহু মূল্যবান টনিক, সালসা, প্রভৃতি দেশী, বিলাতী নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে দেহের জড়তা নষ্ট করিবার প্রয়াস না পাইয়া, ঋষি প্রদর্শিত বিনামূল্যে এই সহজ কৌশলটী যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিলে দীর্ঘায়ু হইয়া স্বাস্থ্যসম্পদ ভোগ করিতে পারিবেন। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও আপনাকে ২৫।৩০ বৎসর বয়সের যুবকের মত দেখাইবে। ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইতে এই সহজ নিয়মটী পালন করিতে পারিলে চুল, দাড়ি, গোঁপ

থাকিবে না, হজমশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সুনিদ্রা হইবে, প্রাণে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিবে। চেহারা ভাল থাকিবে, দেহের ক্ষয় সহজে হইবে না—এ সব পরীক্ষিত সত্য। মোটকথা দিনের বেলায় যত অধিক সময় বাম নাসিকায় এবং রাত্রিতে যত অধিক সময় ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকিবে ততই শরীর সুস্থ থাকিবে, মন ভাল লাগিবে। শরীর কখনও গরম হইবে না। **দেহের শুক্রক্ষয় খুব কম হইবে,** প্রস্রাবের সহিত কিংবা নিদ্রাকালে রেতঃক্ষয় হইবে না।

দিনের বেলায় বাম নাসিকায় এবং রাত্রিতে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইবার জন্য কিছুদিন নিম্নোক্ত প্রণালীটি অভ্যাস করিতে হয়, ক্রমে উহা দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

দিনের বেলায় ডান নাসিকায় এবং রাত্রিতে বাম নাসিকা তুলা বা ন্যাকড়ার পুটুলীদ্বারা বন্ধ রাখিতে হয়। ঐ সময় মুখদিয়া শ্বাস নিতে নাই—একটু কষ্ট হইলেই কিছুক্ষণ নাসিকাদ্বারা শ্বাস নিলেই পরে সহজবোধ হইবে।

———— :: ————
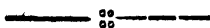
ছাত্রদের অতি সহজে পড়াশুনা মনে রাখিবার কৌশল। সহজে মুখস্থ করিবার কৌশল।

ছাত্র-ছাত্রী বা অন্য যে কেহ পড়াশুনা করিতে কিংবা কোন কবিতা বা পাঠ্যাংশ মুখস্ত করিতে, গান শিখিতে, এক কথায় মন ও মস্তিষ্কের কার্য্য করিতে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে উহা করিলে অতি সহজে ও অত্যল্প সময়ে কৃতকার্য্য হইবেন। যাহাদের

স্মৃতিশক্তি কম, লেখাপড়ায় সহজে মন বসে না বা সহজে মনে থাকে না, তাহারা ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে লেখাপড়ার কার্য্য করিবেন। ইহাতে সহজেই পড়াশুনা মনে থাকিবে এবং ভুলভ্রান্তি হইবে না বা খুব কম হইবে। পরীক্ষার্থীরা ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখিলে অতিশীঘ্র এবং অতি সুন্দরমত উত্তর লিখিতে পারিবেন।
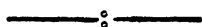
আহার ও খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিধি নিষেধ।

যোগী ঋষিরা আহার ও আহার্য্য দ্রব্য সম্বন্ধেও নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। প্রত্যেকে যদি যখন তখন যা' তা আহার না করিয়া ঋষিদের উপদেশ মত আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন শরীর কত সুস্থ থাকে। আমাদের যত-প্রকার ব্যাধি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, উহার অধিকাংশই অনিয়ম আহার ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ জন্যই সৃষ্টি হইয়া থাকে। রাত্রিতে কদাচই শাক, পাতাজাতীয় দ্রব্য আহার করিতে নাই। উহাতে পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে।

মাছ, মাংস কিংবা ডিম, এই তিনটীর কোনটী সেবনের পরই দুধ, দধি বা মিষ্টান্ন এককথায় দুগ্ধজাত কোন পদার্থই আহার করিতে নাই। উহা ভয়ানক অনিষ্টজনক জানিবেন। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, মাছ মাংস পাতে দুধ না খাইয়া ২।৪ ঘণ্টা পরে খাইলেই আর কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু উহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক এবং অনিষ্ট-জনক কথা। যোগী ঋষিদের উপদেশ এবং আমারও ব্যক্তিগত

সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষভাবে লিখিতেছি যে, যে দিবস মৎস্যাদি আহার করিবেন সে দিন দুধ, দধি কদাচই আহার করিবেন না। ইহার ভালমন্দ ২।১ দিনেই বুঝা যায় না। দীর্ঘকাল পরে ইহার সুফল বা কুফল দেখা দিয়া থাকে। মাছ, মাংসাদি সেবনের দিনে দুধ, দধি খাইলে বাত, রস, অজীর্ণ, শূলরোগ প্রভৃতি জন্মিবার কারণ থাকে জানিবেন কাজেই উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

রাত্রিতে কদাচই দধি খাইতে নাই, রাত্রে দধি ভক্ষণে বাত, শ্লেষ্মাদি পীড়া জন্মিয়া থাকে। দিনের বেলা দধি খাইতেও উহাতে সামান্য জল ও লবণ মিশাইয়া খাইবেন—তাহা হইলে সহজেই দধি হজম হইবে। কাঁচা ঘৃত খাওয়া অর্থাৎ পাতে ঘি খাওয়া বাতবর্দ্ধক। এজন্য ঘৃত পাতে বেশী না খাইয়া ডাল, তরকারীতে রান্নাকালীন দিয়া খাওয়া বিশেষ হিতকর জানিবেন। পাতে ঘি খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতাও জন্মাইতে পারে।

আহার করিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রেই ২।১ ঢোক জল খাইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য আহার করিবেন--ইহাতে পিত্ত ঠাণ্ডা থাকে। চৈত্র মাসে গুড় খাইবেন না। উহা কৃমিবর্দ্ধক

চৈত্র, বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে মাছ খাইবেন না উহাতে কফ পিত্তাদির পীড়া জন্মিয়া থাকে।

রবিবার, বৃহস্পতিবার মাছ এবং মুসুরি ডাইল বিশেষ অনিষ্টকর। ইহাতে প্রস্রাবের পীড়া জন্মিয়া থাকে। কদাচই ঐ দুইদিন মাছ, মুসুরি ডাইল আহার করিবেন না।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী তিথীতে মাংস, দধি এবং অন্য কোনপ্রকার টক্ বস্তু খাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। উহাতেও শ্লেষ্মা, রক্ত বিকৃতির পীড়া জন্মিয়া থাকে।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশী তিথীতে উপবাস করিতে পারিলে শরীর খুব ভাল থাকিবে। নিতান্ত কষ্ট হইলে দুধ, রুটী, মুড়ি এবং ফলফলাদি অল্প পরিমাণ খাইতে পারেন।

মাঝে মাঝে উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী জানিবেন। আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য বড় হরিতকী ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট। তা' ছাড়া মাঝে মাঝে হরিতকী খাওয়া অনেক বিষয় উপকারী। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, মাছ মাংস যে দিন খাইবেন সেইদিন দুধ, দধি প্রভৃতি আদৌ খাইবেন না। ফলতঃ মাছ মাংসাদি যত কম খাইবেন ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। সম্পূর্ণ নিরামিষ খাইতে পারিলে স্বাস্থ্য খুবই ভাল থাকিবে। আয়ু বৃদ্ধি হইবে, মনশুদ্ধি থাকিবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। ঘামে, মলে, মূত্রে, গাত্রে দুর্গন্ধ কম হইবে। নিরামিষ যে দিন খাইবেন সে দিন দুধ, দধি, ঘৃত ইত্যাদি খাইবেন। দুধ দেহের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী বস্তু, পরম সুখাদ্য। তবে কথা কি, ভগবান কোন দ্রব্যই ষোল আনা গুণযুক্ত বা ষোল আনা দোষযুক্ত সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেক দ্রব্যেরই ভাল মন্দ আছে। কোন দ্রব্যের মন্দের ভাগ বেশী, কোন দ্রব্যের মন্দের ভাগ কম, ভালই বেশী। নিরামিষ তরীতরকারী, দুধ ইত্যাদি যদিও অধিকাংশ মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষেই পরমহিতকর, ফলতঃ যাহাদের লিভারের ক্রিয়া ভাল নয় বা লিভারের কোনপ্রকার দোষ আছে, কিংবা অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি

পীড়া আছে তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় অনিষ্টকারক জানিবেন। সুতরাং সর্ব্বদাই বিচার করিয়া আহারাদি করিবেন। তবে মোটের উপর কথা এই যে, নিরামিষ খাদ্যে স্বাস্থ্য যে খুবই ভাল থাকে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আন্দাজ মত কাঁচাহরিদ্রা ও ইক্ষুগুড় খালিপেটে খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়, লিভারের ক্রিয়া ভাল হয়। গায়ের বর্ণ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়, চেহারা সুন্দর হয়।

বুধবার, সোমবার এই দুইদিনই ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য প্রশস্ত। এই দুইদিন ব্যতীত অন্য কোন দিন ক্ষৌরী হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং জন্মবারেও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। মুনিঋষিদের প্রবর্ত্তিত এই সব উপদেশ অনুযায়ী চলা প্রত্যেক মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহারা যে যে নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রত্যেকটীর একটী গূঢ় অর্থ আছে। আমরা প্রত্যেকটী বিষয়ের অর্থ জানি না বলিয়া উহা উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কদাচই দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে নাই। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলে ইন্দ্রিয়শক্তি দুর্ব্বল হয়, মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্মে। প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ করিতে কদাচই আলস্য বা অবহেলা করিবেন না।

দিবা ভাগে রৌদ্রতাপের মধ্যে কোথাও যাইতে হইলে কর্ণ দুইটী রুমাল বা অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাধিয়া যাইবেন—এরূপ করিলে রৌদ্র জনিত কোন অসুখ কদাচই হইবে না। এমন কি সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে থাকিলেও কোন অসুখের ভয় থাকিবে না। রাত্রিতে শীতের ঠাণ্ডা বা শিশিরের মধ্যে কোথায়ও যাইতে হইলে ঐ ভাবে কান দুইটী বাঁধিয়া যাইবেন।

কখনও উটকা বসিতে নাই। এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ও সাবধান থাকিবেন যখনই বসিবেন কোন না কোন প্রকার একটা আসনের উপর ভরদিয়া বসিবেন। উটকা বসাতে অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। এ বিষয় বিশেষভাবে আমাদের দেশের মা, ভগ্নিদিগকে, সতর্ক করিয়া দিতে চাই। তাহাদের বিশেষতঃ রন্ধনাদি কার্য্য করার কালীন ঐ ভাবে বসিবার বিশেষ অভ্যাস দেখা যায়। ইহার ফল অত্যন্ত খারাপ। সুতরাং সর্ব্বদাই পিড়ি বা অন্য কোন আসনোপরি বসিতে অবহেলা করিবেন না।
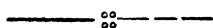
কোষ্ঠ খোলাসা রাখিবার উপায় বাহ্য-প্রস্রাব সম্বন্ধে ঋষিদের গবেষণা।

বাহ্য-প্রস্রাব সম্বন্ধে ঋষিরা যথেষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমাদের বাহ্য পরিষ্কার না হইলেই নানাপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। এ বিষয় লক্ষ্য করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবেন যে, যে দিনই বাহ্য খোলাসা না হইবে সে দিনই কোনপ্রকার অসুস্থতা নিশ্চয় অনুভব করিবেন। কিংবা ২।৩ দিন বাহ্য খোলাসা মত না হইলেই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উহার পরই কোন একটা ব্যাধি আসিয়া দেখা দেয়।

আমি যখন চিকিৎসাকার্য্য করিতাম তখন ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, জ্বর, সর্দ্দিকাশি, হাঁপানী, বাত, টাইফয়েড,

নিউমোনিয়া, অর্শ, অম্ল, পিত্তশূল, মাথাব্যাথা, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণের দুই তিন দিন এমন কি কাহারও কাহারও ৫।৭ দিন পূর্ব্ব হইতেই কোষ্ঠ কাঠিন্যতা বা কোষ্ঠ বদ্ধতা কিংবা বাহ্য খোলাসা না হওয়া ইত্যাদি দেখা দিয়া থাকে।

* আমার নিজের সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার যখন অর্শ ব্যাধি হইয়াছিল তাহার প্রধান লক্ষ্যণই ছিল যে, অর্শরোগ (রক্তস্রাব, টাটানি ইত্যাদি) দেখা দেওয়ার ৮।১০ দিন পূর্ব্ব হইতে বাহ্য খোলাসা হইত না। আর যখন অর্শের আক্রমণ থাকিত না তখন প্রত্যহ রীতিমত বাহ্য পরিষ্কার হইত।

উপরোক্ত প্রকারের রোগীদের ক্ষেত্রেও আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, ঐ ঐ রোগ আক্রমণের পূর্ব্ব সূচনাই ছিল কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্যতা। দেহ সুস্থ রাখিতে হইলে প্রতিদিন যাহাতে বাহ্য পরিষ্কার থাকে, সে দিকে প্রত্যেকেই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। বাহ্য পরিষ্কার হইলে মনও প্রফুল্ল থাকে। অনেকে কোষ্ঠকাঠিন্যতার জন্য নানাপ্রকার জোলাপ (Purgatives) ব্যবহারে অভ্যস্ত। ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর প্রথা। যাহা হউক, যোগীঋষিদের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিলে প্রত্যহ বাহ্য খোলাসা ভাবে নির্গত হইবে।

---

* নিরামিষ আহার এবং যৌগিক প্রক্রিয়াদি দ্বারাই আমি অর্শরোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছি। এবং আরও বহু অর্শ রোগী এই সব যোগক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। ঔষধে এই রোগ প্রায়ই সারে না।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর   পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুযায়ী "জাগরণমুদ্রা" প্রক্রিয়া অনুযায়ী কার্য্য করিবার পর শয্যাত্যাগ করিবেন। কিছু দিন ঐ প্রক্রিয়া মত কার্য্য করিলেই লিভারের ক্রিয়া ভাল হইয়া বাহ্য খোলাসা মত নির্গত হইবে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় মলত্যাগ করিলে পরিষ্কার ভাবে কোষ্ঠ খোলাসা হইবে। সুতরাং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় মলত্যাগের অভ্যাস করিবেন। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় মলত্যাগে যাইতে হয় তখন বাম নাসিকায় একটী তুলা বা ন্যাকড়ার পুটুলী দিয়া মলত্যাগে যাইবেন। কিছুদিন এরূপ করিলেই আপনা হইতেই মলত্যাগ কালীন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইবে। আর প্রস্রাব সম্বন্ধে বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় প্রস্রাব করিতে হয়। কারণ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে প্রস্রাব করিলে দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় জানিবেন। কারণ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে প্রস্রাব করিলে শুক্রক্ষরণ হয় এবং প্রস্রাবও অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে। আমি ইহা শত শত ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া যোগী ঋষিদের গবেষণায় সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি। তবে বাহ্য করিবার কালে প্রস্রাব ত হইয়াই থাকে, তখন ডান নাসিকায় শ্বাসই চলিবে। কিন্তু শুধু প্রস্রাব করিবার কালীন বাম নাসিকায় শ্বাস বহিবার কালীন প্রস্রাব করিবেন। মলমূত্র ত্যাগকালীন দাঁতে দাঁতে জোরে চাপ দিয়া বসিতে ভুলিবেন না। (১১ পৃঃ দেখুন)

যোগী-ঋষি আবিষ্কৃত বিনাঔষধে রোগারোগ্যের

অব্যর্থ কৌশল।

ঔষধ ব্যতিরিকে কেবল নিয়ম পালন এবং যোগ প্রক্রিয়াদি দ্বারা কি করিয়া আমরা সহজ ও কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা এই পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুধী পাঠক, মনোযোগ সহকারে পুস্তকখানা বারবার পাঠ করিলে সমস্তই জ্ঞাত হইবেন। নিম্নে পুনরায় সংক্ষেপে সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য কয়েকটী রোগ সম্বন্ধে আমি পুনরায় কয়েকটী প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিলাম।

অজীর্ণ, উদরাময়াদি ঃ—

১। ভাত, জল, জলখাবার প্রভৃতি যখন যাহা আহার করিবেন, ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে আহার করিতে ভুল বা আলস্য করিবেন না। প্রত্যহই এই নিয়মে আহার করিলে অতি সহজে জীর্ণ হইবে। এমন কি অজীর্ণাদি পীড়া জন্মিতেই পারিবে না। যাহারা অজীর্ণাদি পীড়ায় ভুগিতেছেন তাহারাও এই নিয়মে আহারাদি করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে এবং কিছুদিন এই নিয়ম পালনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যাইবে। আহারের পর বীরাসনে বসিতে ত্রুটী করিবেন না। আহারান্তে কিছু সময় বাম পার্শ্বে শয়ন করিবেন, যাহাদের সময় খুব কম, তাহারাও আহারান্তে যাহাতে অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট সময় বাম পার্শ্বে শুইয়া থাকিতে পারেন, সেই উপায় অবলম্বনের জন্য যত্নবান হইবেন আহারের সময় ও আহারান্তে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিবার জন্য

তুলাদ্বারা বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবেন। সময় থাকিলে আহারের পূর্ব্বে যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে দেখিতে পান, তাহা হইলে ৮।১০ মিনিট বাম বগলে একটী বালিশ চাপা দিয়া বাম কাইত হইয়া শুইয়া থাকিলেই ডান নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে। গুরুভোজন হইলেও এই নিয়মে শীঘ্র জীর্ণ হয়।

২। স্থিরভাবে বসিয়া একমনে একদৃষ্টে নাভিমণ্ডলে নাভিকন্দ ধ্যান করিলে ৭।৮ দিনেই উদরাময়, অজীর্ণাদি পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩ শ্বাসরোধপূর্ব্বক নাভি আকর্ষণ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ শতবার মেরুদণ্ড সংলগ্ন করিলে, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি পীড় আরোগ্য হয় এবং জঠরাগ্নি ও পরিপাকশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। আহার্য্য বস্তুর এক একটী গ্রাস যত বেশীবার চিবাইয়া গিলিবেন—ততই সহজে হজম হইবে। অজীর্ণ, উদরাময় আরোগ্যের ইহাও একটী উৎকৃষ্ট কৌশল জানিবেন।

মাথাধরা :—

যখন মাথা ধরিবে তখন দুই হাতের কনুইয়ের উপর দড়ি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। এই ক্রিয়াদ্বারা ৮।১০ মিনিটেই মাথাধরা আরোগ্য হইবে। বেশ জোরেই বাঁধিবেন, যেন রোগী হাতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। মাথাব্যথা কমিলেই বাঁধন খুলিয়া দিবেন। মাথাধরা টের পাওয়ামাত্র যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন ইহাতে বিশেষ ফল পাইবেন।

আধকপালে মাথাধরাতে,

যে পার্শ্বের কপালে মাথা ধরিবে, সেই পার্শ্বের হাতে—কনুইয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোরে বাঁধিয়া রাখিবেন। অতি সহজে আরোগ্য হইবেন। মাথাধরা বুঝিবামাত্রই যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়া সেই দিকের বগলে বালিশ চাপাদিয়া এবং পূর্ব্বেরমত হাত বাঁধিয়া শুইয়া থাকিবেন। ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আধকপালে মাথাধরার একটী টোট্‌কা ঔষধের বিষয় লিখিতেছি। ঔষধটী অব্যর্থ ফলপ্রদ যাহার প্রবৃত্তি হয়, ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল পাইবেন। পুকুরের জলে ভাসিয়া বেড়ায় একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছ যাহাকে সাধারণতঃ চোক্‌পুনী মাছ বলে (চক্ষুদানীয় বলে) (মাছটী ১॥০ ইঞ্চি কি ২ ইঞ্চি লম্বা হয়, উহার মাথার উপর একখানা সাদা চক্‌চকে পাথরের মত বস্তু আছে) ঐ মাছ একটী লইয়া দানা বা বীচিশূন্য কলার এক টুকরা কলার মধ্যে ভরিয়া ১দিন প্রাতে খালিপেটে রোগীকে খাইতে দিবেন। ঐ ১দিন খাইলেই চিরজীবনের তরে মাথাধরা আরোগ্য হইবে। ঔষধ খাওয়ার পর হয়ত ২।৪ বার কেহ কেহর মাথা ধরিতে পারে কিন্তু কিছুদিন পর উহা আর থাকিবে না, বহু পরীক্ষিত।

শিরঃপীড়াঃ—

শিরঃপীড়ার রোগী ভোরে উঠিয়াই ৫।৭ বার জলদ্বারা মুখ কুলকুচা করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া নাকদিয়া শীতল জল পান করিবেন। এই কার্য্য বিশেষ কঠিনও নহে। বিস্তারিত জানিবার জন্য এই

পুস্তকের "মাথাধরা এবং নাসিকায় সর্দ্দি প্রভৃতি" অধ্যায়টী দেখুন। ঔষধে কদাচই এই পীড়া সারে না। কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্বারা নিশ্চয়ই আশাতীত ফল পাইবেন।

দন্তরোগ ঃ—

প্রত্যহ যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাইবেন, ততবারই উভয় পাটী দাঁতে দাঁতে একত্র করিয়া বেশ জোরে চাপিয়া বসিবেন। মলমূত্র ত্যাগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিবেন, কিছু ২।৪ দিন এই নিয়ম পালন করিলেই নড়াদাঁতও শক্ত হইবে। বরাবর এই নিয়ম পালনে এ জীবনেও দাত পড়িবে না বা দাঁতের কোন পীড়া জন্মিবে না। দাঁত ব্যথাতে ব্যথা থাকা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডাজল ঠাণ্ডা খাদ্যাদি ও ঠাণ্ডা ব্যবহার করিবেন না। ইহাতে রোগ বৃদ্ধি হইবে। গরম জল, গরম খাদ্য, গরম জলে মুখ ধোয়া ইত্যাদি করিলে সহজে কমিবে।

বেদনা ঃ—

বুকে, পীঠে, বা যে কোনও স্থানে ফিক্ বেদনা বা অন্য যে কোন বেদনা হওয়া মাত্র যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে—সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবেন। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই বেদনা কমিয়া যাইবে।

হাঁপানী ঃ—

হাঁপানী রোগীগণ যখন দেখিতে পাইবেন যে, হাঁপানীর টান প্রবল হইতেছে তখন যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় নিঃশ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করিবেন। প্রতিদিন হাঁপানীর আক্রমণ হইলে প্রতিদিনই ঐরূপ করিবেন। দিনের মধ্যে যতবার পারেন—ঐরূপ করিবেন। তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ঐ পীড়া আরোগ্য হইবে।

হাঁপানীর বৃদ্ধির সময় এই নিয়ম পালন করিলে এবং এই পুস্তকের [illegible] হাঁপানী অধ্যায় ৪৪ পৃষ্ঠায় তিনবেলার স্নানের নিয়ম অনুসারে ঠিক্ ঠিক্ সময় ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুকাল (অন্ততঃ এক বৎসর) তিনবেলা স্নান করিলে এই মহাব্যাধির হাত হইতে চিরতরে মুক্তি-লাভ করিতে পারিবেন। হাঁপানী ঔষধে সারে না। তিনবেলা স্নান এবং এই প্রক্রিয়াই এই মহাব্যাধির মহৌষধ বিশেষ জানিবেন। যাহা হইক, হাঁপানীর প্রবল আক্রমণের সময় এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী শ্বাস পরিবর্ত্তন করিলে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই টান কমিয়া যাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

জ্বর :—

জ্বর হইলে যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন। জ্বর আরোগ্য ও শরীর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নাসিকা বন্ধ রাখিতে হইবে। এই কার্য্য করিলে ভোগ কম হইবে অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হইবেন। হয়ত ১৫।২০ দিন ভুগিবার মত জ্বর ৪।৫ দিনেই আরোগ্য হইবে। আর যখনই জ্বরের আক্রমণ বুঝিবেন, তখন হইতেই মনে মনে সর্ব্বদা রূপার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধ্যান করিবেন—ইহাতে অতি সত্বর জ্বর আরোগ্য হইবে। আমি চিকিৎসা ব্যবসার কালীন এই প্রক্রিয়া দুইটী দ্বারা জ্বররোগী ক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখিয়াছি। যেখানে এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছি—সেখানেই দেখিয়াছি অতি কঠিন প্রকৃতির জ্বর রোগীতেও জ্বরের ভোগ অনেক কম হইয়াছে জ্বরের অন্যান্য উপসর্গাদি খুব কম এবং মৃদুভাবের হইয়াছে এবং ঔষধ বেশী কিছু দিতে হয় নাই। অল্প ঔষধেই, অল্প সময়ে ঐ রোগী

আরোগ্য হইয়াছে। ইহা বহুশত জ্বর রোগী ক্ষেত্রে আমি পরীক্ষা করিয়াছি। প্রত্যেক চিকিৎসক আমার ন্যায় তাহাদের নিজ নিজ রোগীতে এই সব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—ইহাই আমার অনুরোধ।

তন্ত্র শাস্ত্রে আছে, নিসিন্দার মূল রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিলে, সকল প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে। আমি ইহাও পরীক্ষা করিয়াছি—ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

বাত :—

প্রতিদিন দুইবেলা আহারের পর বীরাসনে বসিয়া অর্থাৎ দুই পা ও হাঁটু পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া, উহার উপর চাপিয়া ১৫।২০ মিনিট বসিয়া থাকিবেন এবং মহিষের শৃঙ্গের চিরুণী দ্বারা মাথা আচড়াইবেন। এরূপ ভাবে মাথা আচড়াইবেন যেন মস্তকে চিরুণীর কাঁটা স্পর্শে করে। প্রত্যহ দুইবেলা ১৫।২০ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টা-কাল ঐরূপ করিলে যত দিনের বাত হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। যাহারা সুস্থ আছেন তাহারাও প্রতিদিন এই নিয়ম পালন করিবেন, তাহা হইলে এজীবনে কোনদিনই বাতের কোন প্রকার পীড়া জন্মিবে না।

চক্ষুরোগ ঃ—

প্রত্যহ প্রাতে, সন্ধ্যায় হাত-মুখ ধুইবার কালীন এবং স্নান-কালীন, সর্ব্বাগ্রে মুখের ভিতর যত জল ধরে, তত জল লইয়া, অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে ১৫।২০ বার ঝাপ্‌টা দিবেন, এবং মাঝে মাঝে জল দ্বারা কপাল ধুইয়া দিবেন। আহারের পর মুখ ধুইবার কালীন কিম্বা যখনই জলের কোন কাজ করিবেন, তখনই ঐরূপ করিতে ভুলিবেন না।

প্রত্যহ স্নানকালীন তৈল দেওয়ার সময় সর্ব্বাগ্রে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে বেশ করিয়া এক মিনিট সময় সরিষার তৈল মালিশ করিবেন। এই কয়টী নিয়ম পালনে, চক্ষু খুব ভাল থাকিবে, কোন দিনও চক্ষুর কোন পীড়া হইবে না। বিস্তারিত ১মভাঃ, ২৬ পৃঃ দেখুন।

বিষাক্ত কীটাদি দংশনে ঃ—

বিষাক্ত কীট্ যেমন, বোল্‌তা (বল্লা), ভীমরুল (ভিঙ্গুল) মধুমক্ষিকা, চেলা, বিচ্ছু (বৃশ্চিক) প্রভৃতিতে দংশন করিলে আদৌ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ একগ্লাস (অন্ততঃ অর্দ্ধসের) ঠাণ্ডা জল পান করিবেন। ইহাতে ঐ দংশনজনিত যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না এবং যন্ত্রণার আশু উপশম হইয়া আসিবে। আবশ্যক হইলে ১৫।২০ মিনিট পর আর এক গ্লাস জল পান করিবেন।
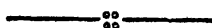
সর্পভয় নিবারণের উপায়।

ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতঃ নর্ম্মদায়ৈ নমোনিশি।
নমোঽস্তু নর্ম্মদেতুভ্যং ত্রাহি মাং বিষ সর্পতঃ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে নর্ম্মদা নদীকে প্রণাম করিবেন। তাহা হইলে কদাচই সাপে কামড়াইবে না। শাস্ত্র বিশ্বাস করুন।

ওঁ দৃষ্টকর অদৃষ্ট কালিঙ্গনাগ হরনাগ।
সর্পতুণ্ডী বিস্মুদাঢ় বন্ধনং শিবগুরু প্রসাদাৎ॥

এই মন্ত্রটী সাতবার পড়িয়া, পরিধেয় বস্ত্র কিংবা চাদরে গীট দিবে। ঐ গীট দেওয়া বস্ত্রখানা যতক্ষণ সঙ্গে থাকিবে, ততক্ষণ সাপে কামড়াইবার ভয় থাকিবে না।

তন্ত্র শাস্ত্রে আছে যে, শ্বেত পুনর্ণবার মূল পুষ্যানক্ষত্রে উঠাইয়া ঘরে রাখিলে, সেই ঘরে সাপ আসে না বা থাকে না।

ওঁ আস্তিকস্য মূনির্মাতা ভগিনী বাসুকীস্তথা।

জরৎকারু মুনেপী মনসাদেবী নমস্তুতে—

রাত্রিতে শয়নকালে শয্যায় শুইয়া উপরের এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবেন এবং তিনবার "আস্তিক" শব্দ উচ্চারণ করিয়া বালিশে তিনটী টোকা দিবেন, পরে তিনবার "গরুর" শব্দটী উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনটী টোকা দিবেন। এইরূপ করিয়া রাত্রিতে শুইলে সেই রাত্রে সর্প দংশনের ভয় থাকে না।

প্রত্যেক রবিবার কিংবা বৃহস্পতিবার মনসাদেবীকে ১টী সবরীকলা ও কিছু দুধ, চিনি বা বাতাসা একটী পাথরের পাত্রে দিলে সাপে কামড়ায় না। পুরহিতকে বলিবেন ঐ দুধ, কলা, চিনি মনসা-দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে।

দাম্পত্য প্রেম বর্দ্ধনের এবং সুসন্তান লাভের অব্যর্থ যৌগিক প্রক্রিয়া

কামশাস্ত্রের মাত্র কয়েকটী।

স্ত্রী-সংসর্গ বিষয়ে যোগী ঋষিরা যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অযথা অসময়ে যত্র তত্র ইন্দ্রিয় পরিচালনা না করিয়া ঐ সকল নিয়মানুযায়ী স্ত্রী-সম্ভোগ করিলে সংসার আনন্দময় হইবে এবং স্বাস্থ্যবান, ধার্ম্মিক ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভে জীবন ধন্য হইবে।

স্ত্রী সম্ভোগের নিয়ম।

পুরুষের ডান নাসিকায় এবং স্ত্রীর বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস বহনকালে স্ত্রী-সংসর্গ করিতে হয়। অন্যথায় দাম্পত্য সুখ ভোগ হয় না কারণ, পুরুষের বাম ও স্ত্রীর ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত কালীন সম্ভোগ করিলে পুরুষের বীর্য্য অগ্রে পতন হয়। স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা মিটে না, ফলে স্ত্রীর নানাপ্রকার জরায়ুর পীড়া দেখা দিয়া থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনেপ্রাণে আসক্তি জন্মে না। স্ত্রীর ডান নাসিকায় শ্বাস বহনকালে পুরুষ স্ত্রীসংসর্গ করিলে স্ত্রীর কামোত্তেজনা সহজে হয় না এবং স্ত্রীর সম্ভোগ বাসনা নিটে না। কাজেই পুরুষের ডান নাসিকায় এবং স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় শ্বাস বহনকালে দাম্পত্য সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিবেন। ইহাতে উভয়ের শরীর ভাল থাকিবে এবং দাম্পত্য প্রেম বর্দ্ধিত হইবে। প্রণয়িনীও বশীভূতা থাকিবে। স্ত্রী-সম্ভোগের পর স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দম্‌ভোর শীতল জল পান করিবেন। ইহাতে উভয়ের শরীর সুস্থ থাকিবে।

স্ত্রী সংসর্গের পর পুরুষ ডান কাইত হইয়া শয়ন করিবেন এবং স্ত্রী বাম কাইত হইয়া শয়ন করিবেন। ইহাতে পুরুষের বাম নাকে এবং স্ত্রীর ডান নাকে শ্বাস বহিবে। এতদ্বারা সম্ভোগজনিত শরীরের ক্ষয়, দুর্ব্বলতা নিবারিত হইবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরীর সুস্থ হইবে এবং সুনিদ্রা হইবে।

পুরুষের ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময়ে স্ত্রীসঙ্গম করিবার আরও একটী গভীর উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই যে, ডান নাসিকায় শ্বাস বহনকালে স্ত্রী সম্ভোগ না করিয়া, বাম নাসিকায় শ্বাস বহন-কালে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষরণ হয়। যে সব বিষয় লিখিত হইল, তাহা সত্য কিনা, প্রত্যেক বিবাহিত লোক মাত্রেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সুসন্তান লাভের কৌশল।

নারীদিগের মাসিক ঋতুর পর ষোল দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিবার দিন। ইহার পর বাকী কয়দিন আর গর্ভধারণের শক্তি থাকে না। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই ষোল দিনের মধ্যে ঋতুর প্রথম চারিদিন, একাদশ এবং ত্রয়োদশ দিবস স্ত্রী সম্ভোগ করিবেন না। বাকী দশদিনের মধ্যে যত শেষের দিকে (যত দিন গত করিয়া) স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন ততই সৌভাগ্যবান্ বলবান্, ধনবান্, স্বাস্থ্যবান্, ধার্ম্মিক এবং দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করিবেন। আর একটী কথা এই যে, ঐ বাকী দশদিনের মধ্যে যত শেষের দিকে সম্ভোগ হয় ততই মঙ্গলের কারণ এবং যে রাত্রে সম্ভোগ করিবেন সেই রাত্রের তৃতীয়

প্রহর অতীত হইয়া, চতুর্থ প্রহর আরম্ভ হওয়া মাত্রই সম্ভোগকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু সাবধান, শেষ রাত্রে বা ভোর বেলায় স্ত্রী-সম্ভোগ করা না হয়—উহা বিশেষ অমঙ্গলজনক।

রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে স্ত্রী-সম্ভোগ উৎপন্ন সন্তান যথাক্রমে সল্পায়ু, দরিদ্র, দুর্ভাগা, কুমতিবিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যহীন হয়। সুতরাং শাস্ত্রের বিধান এই যে, সুসন্তান লাভের আশায় উপরোক্ত ছয়দিন বাদ দিয়া বাকী দশদিনের মধ্যে রবিবার, হরিবাসর এবং পঞ্চপর্ব্ব বাদে অন্যদিন রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভে গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চপর্ব্ব যথা :—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও সংক্রান্তি, এই কয়টী দিনকে পঞ্চপর্ব্ব বলে। পঞ্চপর্ব্ব দিনে স্ত্রী পুরুষের শুক্র-শোনিতাদি দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং কদাচই ঐ ঐ দিনে স্ত্রী-সম্ভোব করিবেন না।

গর্ভাধান-কালীন কর্ত্তব্য।

যে দিন গর্ভাধান করিবে, সেই দিন স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হইয়া সারাদিন ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা করিবেন। অতঃপর রাত্রিতে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য কাপড়ে, বস্ত্রে ও শয্যায় লাগাইয়া শয়ন করিবেন।

পুরুষ স্ত্রী-সম্ভোগের পূর্ব্বে স্ত্রীকে পূর্ব্বরাগ দ্বারা অর্থাৎ নানা-প্রকার কামোত্তেজক কার্য্যাদি দ্বারা (আলিঙ্গন, স্পর্শ, সুড়সুড়ি,

চুম্বন), স্ত্রীলোকদের কামস্থানগুলিকে উত্তেজিত করিয়া লইবেন। অতঃপর যখন দেখিতে পাইবেন যে, স্ত্রী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পুরুষকে দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ করিতেছেন, তখন উভয়ে আনন্দ চিত্তে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, সুসন্তান লাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতঃ ধর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে সম্ভোগ-সুখ-ভোগ করিবেন। এইভাবে কার্য্য করিলে সেই গর্ভজাত সন্তান স্বাস্থ্যবান, ধার্ম্মিক, উদার প্রকৃতি, সৌভাগ্যবান, বলবান, সুখী ও দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, গর্ভাধানকালে দম্পতী যেরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করতঃ গর্ভাধান কার্য্য নিষ্পন্ন করেন—সন্তান সেইরূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাধানকালে স্বামী-স্ত্রী একান্ত দৃঢ় বাসনা পোষণ করিবেন যে, সন্তানটী যেন স্বাস্থ্যবান, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, দীর্ঘায়ু, অর্থবান প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়।

স্ত্রী-পুরুষের কামস্থান

পুরুষের শুক্লপক্ষে—পদ, গুল্‌ফ, জাণু, জঙ্ঘা, কুক্ষিতে চন্দ্রকলা অবস্থান করে।

কৃষ্ণপক্ষে—বক্ষঃ, কণ্ঠ, কপাল, ওষ্ঠ, নেত্র, মস্তক প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রকলা বিরাজ করে।

স্ত্রীজাতীর শুক্লপক্ষে—বক্ষে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, নেত্রে, ললাটে চন্দ্রকলা অবস্থান করে।

কৃষ্ণপক্ষে—পদে, গুল্‌ফে, জাণুতে, জঙ্ঘায় ও কুক্ষিতে চন্দ্রকলা অবস্থান করে।

আহার

ইহা সকলেই জানেন যে, আমাদের দুই প্রকার আহার্য্য বস্তু আছে—আমিষ এবং নিরামিষ। গবেষণা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আমিষ এবং নিরামিষ আহারের মধ্যে নিরামিষ আহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাছ মাংস খুব মুখরোচক বটে, কিন্তু উহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তত উপকারী নহে, পরন্তু কোন কোন অবস্থায় মাছ মাংস আহার অতীব অনিষ্টজনক। মাছ মাংস দেহাভ্যন্তরে উষ্ণভাব সৃষ্টি করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য বা কোষ্ঠ বদ্ধতা জন্মায়, কিছু বেশী খাইলে পেট ভার করে, পটে বায়ু জন্মায়। নিরামিষভোজীর দৈহিক ও মানসিক চঞ্চলতা কম হয়। আমিষভোজী, নিরামিষভোজী অপেক্ষা ক্রোধি, কামুক, হিংস্রুক, পরশ্রীকাতর বেশী হইবে। একজন নিরামিষ-ভোজী, ঐ ঐ বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হইলে—পুনরায় যত সহজে ঐগুলিকে সংযত করিতে পারিবে—আমিষভোজী তত সহজে পারিবে না। রীতিমত নিরামিষভোজীর মলত্যাগকালীন সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, তাহার অর্শ, ভগন্দর, গুড়াকৃমি প্রভৃতি গুহ্যদেশের ব্যাধি জন্মিতে পারে না। যাহাদের ঐ সব ব্যাধি আছে—তাহারা অতি অবশ্যই নিরামিষভোজী হইবেন। দীর্ঘকাল নিরামিষ আহার ও এই পুস্তকে লিখিত আহারকালের নিয়মাদি, আহারের পরের কর্ত্তব্য এবং মূলশোধন প্রক্রিয়া প্রতিপালনে অর্শ, ভগন্দর, গুড়াকৃমির কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন—এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। নিরামিষভোজীর আয়ুর পরিমাণও, আমীষভোজী অপেক্ষা অনেক বেশী। তারপর,

মানসিক কার্য্যের ব্যাপারে, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সন্ধ্যাবন্দনাদি ভগবৎ আরাধনা ইত্যাদি কার্য্যে নিরামিষভোজীরাই আমিষভোজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, যুদ্ধাদির কার্য্যে, সৈনিকের কার্য্যে আমিষভোজী হওয়া আবশ্যক। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক কথা। পরন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একজন নিরামিষভোজী সৈনিক যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত যুদ্ধকার্য্য চালাইতে পারিবেন—আমিষভোজী দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব হইবে না। আমিষভোজীর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সমুদয় বৃত্তিগুলিই নিরামীষভোজী অপেক্ষা স্থূলভাবাপন্ন হইবে। নিরামিষভোজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আদালতের বিচারক কিংবা আইনজ্ঞ অথবা নিরামিষভোজী চিকিৎসক, কার্য্যক্ষেত্রে যত সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন—আমিষভোজী ঐ ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাহা পারিবেন না—ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ফলতঃ নিরামিষ আহার আমিষ আহার অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও, বাঙ্গালীর পক্ষে মাছ মাংস খাদ্য এতই প্রিয় যে, উহা একেবারে ত্যাগ করা অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষেই একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই যখন সত্য, তখন অন্ততঃ নিম্নলিখিত ভাবে আহারাদি করিতে প্রত্যেকেই চেষ্টা ও অভ্যাস করিবেন। প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই অনুরোধ করিতেছি যে, মাছ মাংস কম খাবেন। অর্থাৎ নিরামিষ আহারের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিবেন এবং সপ্তাহের মধ্যে বা মাসের মধ্যে নিরামিষ আহারের দিনই বেশীর ভাগ হইবে। মাছ মাংস খুব কম দিনই

খাওয়ার চেষ্টা করিবেন। যেমন, সপ্তাহে ৫ দিন নিরামিষ, ২ দিন আমিষ সেইরূপ মাসে ২০ দিন নিরামিষ, ১০ দিন আমিষ। মাসে ২০ দিন নিরামিষ খাওয়া খুব বেশী কথা নয়, পরন্তু ১০ দিন মাছ মাংস খাওয়াও কম নয়—এবং চেষ্টা করিবেন প্রতি মাসেই মাছ মাংস যত কম খাইয়া পারেন। যত কম খাইতে পারিবেন অর্থাৎ মাছ মাংস আহারের পরিমাণ যত কমাইয়া আনিবেন, উহা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইবে। আর ১টী বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, যেদিন মাছ মাংস খাইবেন সেদিন দুধ একেবারেই খাবেন না। এ বিষয় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। মাছ মাংস পাতে দুধ খাওয়া কিংবা মাছ মাংস যেদিন খাবেন সেদিন আদপেই দুধ খাওয়া বিষবৎ পরিত্যাজ্য জানিবেন। তবে দুধ না খাইয়া কোন কোন দিন একটু দধি খাইতে পারেন—তাহাও রাত্রে কদাচই খাইবেন না। রাত্রে দধি খাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর জানিবেন, ইহাতে বাত, শ্লেষ্মা রোগ জন্মে। অতঃপর মাংসের মধ্যে কবুতরের মাংস বা কচি পাঠার মাংসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আজকাল অনেক শিক্ষিত হিন্দু-পরিবারের মধ্যেই মুরগীর মাংস খাওয়ার বড় প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু মুরগীর মাংস আবার কোন বিষয়ে যে অত্যন্ত অনিষ্টজনক তাহা বোঝা উচিত। মুরগীর মাংস অত্যন্ত গরম এবং খুব কামোত্তেজক। ~~বটে, কিন্তু~~ মুরগীর মাংস অত্যন্ত শুক্রচাঞ্চল্য জন্মায়—এজন্য ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ডিম্বও (হাঁসের বা মুরগীর) খুব গুরুপাক খাদ্য এবং অত্যন্ত কামোদ্দিপক। দেহ হইতে শুক্রধাতুকে বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা ডিম্বের খুব বেশী। এজন্য বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবক যুবতীর ডিম খাওয়া কখনই

উচিত নয়। ইহাতে রাত্রিতে স্বপ্নদোষ বাড়াইবে এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ঘটাইবে। ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নিরামিষ তরীতরকারীর মধ্যে পেঁপে তরকারী খুব উৎকৃষ্ট তরকারী। ইহা পাকা অবস্থায় খাওয়া কিম্বা কাঁচা তরকারী পাক করিয়া খাওয়া উভয়েই দেহের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহাতে লিভারের ক্রিয়া ভাল হয়, বাহ্য পরিষ্কার হয় সুতরাং অর্শ বা কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগীদের পক্ষে ইহা পরম সুখাদ্য জানিবেন। এতদ্ভিন্ন যে কোন তরী-তরকারীই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তবে যে সমস্ত তরকারী মাটীর তলে জন্মিয়া থাকে যেমন আলু, কচু প্রভৃতি উহারা একটু পেট ভার করে ফলতঃ নিয়মিত পরিমাণ মত সেবনে বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। মাছ মাংসের মত ক্ষতি সাধন ইহারা কদচই করে না। নিরামিষ-ভোজীদের প্রত্যহ একটু ঘৃত খাওয়া ভাল এবং দুধ খাওয়া আবশ্যক। ঘৃত বলিতে গব্যঘৃতই ব্যবহার্য্য। এতদ্ভিন্ন পাতে ঘি খাওয়া অর্থাৎ গরম ভাতে ঘি খাওয়া বাত বর্দ্ধক, এজন্য পাতে ঘি বেশীর ভাগ না খাইয়া উহা ডাল, তরকারীর মধ্যে রান্নাকালীন দেওয়াই উত্তম। মাখমও দেহের পক্ষে খুবই হিতকর।

আহার সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নিয়ম আমাদের জানা দরকার এবং সেই মত কার্য্য করিয়া দেহকে সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমান মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। খাইতে বসিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বা অন্য কাহারও অনুরোধে পড়িয়া বা লজ্জায় পড়িয়া কখনও অতিরিক্ত খাইতে নাই, ইহা মস্ত অপরাধ। আবশ্যকের অতিরিক্ত আহার করিয়া অনেকের আমাশয়, বদ্‌হজম এমন কি কলেরা পর্য্যন্ত হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এজন্য লিখিতেছি, মনে মনে দৃঢ়

প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইবেন যে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বা অন্যের অনুরোধে কখনও অক্ষুধায় বা কম ক্ষুধায় খাইবেন না বা অতিরিক্ত আহার করিবেন না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, আবারও লিখিতেছি যে, যেদিন ডিম, মাছ বা মাংস খাইবেন সেইদিন দুধ স্পর্শও করিবেন না। অনেকে মনে করেন যে, মাছ খাওয়ার পর দুধ খাওয়া চলে, তাহাতে কোন ক্ষতি করে না—শুধু মাংস খাওয়ার পর বা ডিম খাওয়ার পর দুধ না খাইলেই হয়, কিন্তু জানিবেন ইহা খুবই ভুল, পরন্তু, অত্যন্ত অনিষ্টকর—ইহা দৃঢ় ভাবে মনে জাগরূক রাখিবেন। ২।৪ দিনেই কোন খাদ্যের ভাল মন্দ বুঝা যাইতে না পারে, নিতান্ত বিষ ব্যতীত যখন তখন কুফল কোন কিছুতেই ফলে না। ডিম, মাছ প্রভৃতি খাওয়ার পর দুধ খাওয়ার কুফল হয়তঃ ২।৪।৫ বৎসরেও ধরা পড়ে না—, ইহা এত সূক্ষ্মভাবে শরীরের ক্ষতি করিতে থাকে যে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। নিতান্ত পেটের রোগী যাহারা তাহারা হয়তঃ ২।১ দিনেই ইহার কুফল টের পাইবেন। নতুবা সহজে ইহার কুফল বোধগম্য হয় না কিন্তু যখন ইহার কুফল দেখা দেয় তখন - ইহার প্রতিকার বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়ে। যৌবনের অত্যাচারের ফল, বৃদ্ধকালে ভুগিতে হয়। অনেকে কহিয়া থাকেন, বৃদ্ধকালে ভুগিব, সে ত অনেক দেরীর কথা, এতদিন হয়তঃ বাঁচিবও না। তবে এই যৌবনকালেই যথেচ্ছা ভোগ করিয়া যাই না কেন? ইহা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি মানবের উক্তি ব্যতীত আর কিছু নয়। যৌবনকালে যিনি আহার, বিহার সর্ব্ব-বিষয়েই সংযত থাকিবেন নিশ্চয়ই তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিবেন—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বাল্যকাল হইতেই আহার বিহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে সংযত ভাবে

কাটাইয়াও অল্প বয়সেই মরিয়া যায়—এরূপ ঘটনা যে না আছে তা' নয়, তবে খুব কম। সংযত জীবনই দীর্ঘায়ু লাভের প্রধান উপায় জানিবেন। কেবল আহার বিষয়েই সংযত হইলে চলিবে না, সর্ব্ব বিষয়েই সংযত হইতে হইবে। তবে এখানে আহারের সংযমতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি।

রাত্রে লঘুদ্রব্য আহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। তা' ছাড়া রাত্রে কদাচই দিবসের মত পেট ভরিয়া খাইতে নাই। মাঝে মাঝে উপবাস করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। পূর্ণিমা, একাদশী, অমাবস্যা অন্ততঃ এই ৩টী তিথীতে অন্ন গ্রহণ না করা খুবই ভাল। তা' ছাড়া, মজুর শ্রেণী ব্যতীত মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের প্রতি সপ্তাহে ১ দিন (দিবারাত্র) ভাত না খাইয়া অন্য কিছু (যেমন, খই, মুড়ি, চিড়া নারিকেল, কলা, পেঁপে, দুধ ইত্যাদি পরিমাণ মত অর্থাৎ ভাত খাইবে না বলিয়া ঐ সব দ্রব্যই বেশী পরিমাণ খাওয়াও সঙ্গত নয়—উদ্দেশ্য সপ্তাহে ১ দিন লঙ্ঘন দেওয়া) খাওয়া ভাল। অন্ততঃ দিবারাত্রি সম্ভব না হইলে ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ ১টী দিন বা ১টী রাত্র লঙ্ঘন দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। ইহা আমার নিজ দেহে এবং আরও বহু লোকের দেহের উপর পরীক্ষা করিয়া তবেই লিখিতেছি। একটী বাংলা প্রবাদ আছে যে "যদি বেশী খেতে চাও, তবে কম খেও" এ কথার অর্থ এই যে, যদি কোন জিনিষ বেশী দিন খাইতে চাও, তবে যখনই উহা খাও পরিমণ মত খাইও বা একটু কমই খাইও—তবেই কোন অসুখ করিবে না—সুতরাং অনেক দিন খাইতে পারিবে, কাজেই

মোটের উপর ঐ জিনিষ বেশীই খাওয়া হইবে—অন্যথায় হয়তঃ একদিন বেশী খাওয়ার ফলেই, আর জীবনে উহা খাওয়া না হইতে পারে, প্রবাদটী খুবই সত্য। মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী, ইহাতে শরীর খুব ভাল থাকে। এতদ্দ্বারা দেহ পরিশ্রমী, আলস্যহীন, নীরোগী হইবে। কতগুলি ব্যাধি যেমন জ্বর, পেটের অসুখ, আমাশয়, বাতের চাবানী বা কামড়ানী, এগুলি প্রায় হইতেই পারে না —হইলেও অতি সহজে আরোগ্য হইবে। আহার সম্বন্ধে যে কয়টী বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম—প্রত্যেকেই পালন করিতে যত্নবান হইবেন—এতদ্দ্বারা আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই জীবন আনন্দময় হয়, কারণ "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল" ইংরাজীতেও একটী কথা আছে—"Health is wealth."

ইচ্ছাশক্তি

(উহা বর্দ্ধন ও প্রয়োগের কৌশল)

এই সংসারে, এই পৃথিবীতে আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার মূলে রহিয়াছে—আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত **ইচ্ছাশক্তি**। এই ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই আমরা সদসৎ, পরোপকার বা আত্মোপকার যে কোন কার্য্যই করিয়া থাকি। যেখানে আমরা ইচ্ছাশক্তির চালনা বেশী পরিমাণ করি, সেইখানে কার্য্যটীও

আমরা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবং অধিকতর কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। এই ইচ্ছাশক্তি প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই তুল্যভাবে বিরাজিত। এই শক্তিটীকে সুপ্তাবস্থায় নিজেদের অন্তরে রাখি বলিয়াই ইহার অপরিসীম ক্রিয়াশক্তি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অজ্ঞ। ইচ্ছাশক্তি (will power) জাগ্রত করিতে পারিলে উহাদ্বারা অমানুষিক কার্য্য করা যায়। আমরা যে হিন্দু মুনিঋষিদের নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্যাদির কথা শুনিতে পাই তাহা আর কিছুই নয়, এই ইচ্ছাশক্তিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এই ঘোর কলিযুগেও আমাদের মত সাধারণ মানুষও ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে কত কি অস্বাভাবিক কার্য্যকলাপ দেখাইয়া কত যশ ও অর্থ অর্জ্জন করিতেছেন। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই হয়তঃ শ্রদ্ধেয় পি, সি, সরকার মহাশয়ের নাম অবগত আছেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, শুধু ভারত কেন, এমন কি, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও বিশেষ যশ ও কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। যত বড় "গুণ বা পূরণ" অঙ্কই হউক না কেন তিনি কাগজ পেন্সিলের সাহায্য ব্যতিরেকেই ২।৪ সেকেণ্ডের মধ্যেই উহার "ফলটী" বলিয়া দিতে সক্ষম হয়েন। যে কোন কিছু দ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করা হউক না কেন, এমন কি পুলিশের "হাতকড়া" দ্বারা হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া দিলেও চাবি ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি উহা খুলিয়া ফেলিতে পারেন। ইংলণ্ড ও জাপানে তিনি ঐরূপ একটী ক্রিয়া দেখাইয়া সমস্ত পৃথিবীতে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি গর্ব্বের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এমন কোন "হাতকড়া" নির্ম্মিত করা সম্ভব হইবে না—যাহা তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনা চাবিতে

খুলিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহার ঐ গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য ঐ ঐ দেশের বহু বৈজ্ঞানিক ঐরূপ হাতকড়া তৈয়ারের জন্য দিনরাত খাটিতে লাগিলেন। অবশেষে এমন একটী হাতকড়া তাঁহারা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, চাবির সাহায্য ব্যতিরেকে উহা খুলিতে পারা অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করেন। কিন্তু পাঠক বর্গ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, মিঃ সরকার—ঐ কয়ড়া দ্বারা তাঁহার আবদ্ধ হস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অলৌকিক কার্য্য তিনি কিরূপে সম্পন্ন করেন—এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, "আমার তীব্র ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আমি উহা খুলিয়া থাকি—অন্য কোন মন্ত্র বা কৌশল নয়।" তিনি আরও বলেন যে, ঐ ইচ্ছাশক্তি প্রত্যেক মানবের হৃদয়েই তুল্যভাবে বিরাজিত। যে কেহ অভ্যাসের সাহায্যে ঐ ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারেন।

ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আমরা অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতে পারি, যদি একটু ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে উহার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া নেই। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ফলে অনেক কু-অভ্যাস দূর করা যায়। এমন কি, রোগী বিদেশে থাকিলেও শুধু এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ফলেই দূর হইতেই তাহার কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কোন দূরস্থিত ব্যক্তিকে নিজের নিকট আনয়ন করা যায়। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উপরও আধিপত্য জন্মে। ঝড়, তুফান, অগ্নিদাহ ইত্যাদি ব্যাপারও ইচ্ছাশক্তি (will power) প্রয়োগের ফলে দমন করা যায়। এতদ্ব্যতীত অপরকে নিজের মতানুযায়ী মত প্রকাশ

করাইতে, অপর ব্যক্তিদ্বারা নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করাইতে—ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগই যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকরী, ইহা জনসমাজে লক্ষ্য করিলে সকলেই অতি সহজে ধরিতে পারিবেন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ফলে কঠিন কঠিন ব্যাধিগুলি চিরতরে আরোগ করা যায়, এবং অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। কারণ, ইহাতে ঔষধ বা পুস্তকের কোনই মূলধন লাগে না। কোন ডিস্পেন্সারীর আবশ্যক করে না, শুধু মনেপ্রাণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা দূরদেশে অবস্থিত ব্যক্তিরও কঠিন ব্যাধি অনায়াসে আরোগ্য করা যায়। একটু যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইচ্ছা-শক্তিটীকে জাগ্রত ও তীব্র করিয়া নিলেই কার্য্যক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যত্ন ও অধ্যবসায় ব্যতীত জগতে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না—ইহা একটা সাধারণ নিয়মের কথা! এই ইচ্ছাশক্তি কাহারও নিকট হইতে ধার বা হাওলাত করিতে হয় না, ইহা ভগবান প্রদত্ত, প্রত্যেকেরই নিজস্ব। অনেকের ধারণা—এই শক্তি সাধনায় সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারী হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত ও অভিজ্ঞতা এই যে, নিরামিষ আহার করিতে পারিলে উত্তম বটে, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়—সুতরাং আমিষ আহারিগণও এই পুস্তকে উল্লিখিত নিয়ম প্রণালী যথাযথরূপে পালন করিতে পারিলে, এই শক্তি সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে ইহা সত্য যে, কতকগুলি খাদ্য আহার করা সঙ্গত নয়, কারণ উহাতে দেহের ও মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি করে। ডিম, পেয়াজ, রসুন, মাংস, অত্যধিক মসলাযুক্ত খাদ্য ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি কেহ এই শক্তি সাধনার

নিমিত্ত মাছ, মাংস আহার পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতে সক্ষম হন—এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন—সেত অতি উত্তম কথা—তাহার সিদ্ধিলাভ খুব সহজে হইবে, যেহেতু এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট সংযম নিহিত থাকায়—উহারা মনের শক্তি অর্জ্জনে অতিশয় সাহায্য করিয়া থাকে। শিক্ষার্থী আহার বিহার সম্বন্ধে সংযম অবলম্বনে ভীত বা পশ্চাৎপদ না হইয়া বীরের ন্যায় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অধিক পরিমাণে বিকশিত করিতে সমর্থ হইবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সকল বয়সের এবং সকল অবস্থার লোকই এই শক্তি-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন এবং কিছুদিন যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে—**এই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।** এই সাধনায় সর্ব্বপ্রথমেই চাই **"আত্মবিশ্বাস"**। এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস চাই যে, "আমার মধ্যে এই মহাশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত—আমি ধৈর্য্য-সহকারে কিছুদিন সাধনা করিলেই নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।" আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প, কঠোর সাধনায় ও অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে যিনিই এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। প্রথম প্রথম সাধনার কালে একটু একটু কৃতকার্য্য হইলেই মনে অপরিসীম আনন্দ পাওয়া যায় এবং ঐ আনন্দই দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মাইয়া থাকে।

ইচ্ছাশক্তি বৰ্দ্ধনের উপায়—

"যাদৃশীভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'
শাস্ত্রের এই সত্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাধক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। যাহার যেরূপ ভাবনা বা সংকল্প, তাহার কৃতকার্য্যতাও সেই অনুযায়ীই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভাবনা বা সংকল্পের দৃঢ়তা অনুযায়ী কর্ম্মের কৃতকার্য্যতা হইয়া থাকে। যাহার সংকল্প যত দৃঢ়, তাহার কৃতকার্য্যতাও তত বেশী।

ইচ্ছাশক্তি বৰ্দ্ধনের বহুবিধ প্রণালী আছে, তন্মধ্যে আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি "অটো-সাজেষ্টিভ মেথড্ই' (Auto suggestive method) সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। সেইজন্য উক্ত প্রণালীর বিষয়ই আমি পাঠকবর্গের নিকট উল্লেখ করিতেছি। "অটো সাজেস্‌সান" অর্থ নিজের প্রতি নিজের আদেশ প্রদান। অর্থাৎ কোন একটী বিশিষ্ট ভাবকে কোনও বিশেষ প্রথা প্রণালী বা কৌশলে চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের বারংবার অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের অন্তরে অর্থাৎ মনের মধ্যে সুদৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া। আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় ইহাকেই ইচ্ছাশক্তি বৰ্দ্ধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল বলিয়া স্থির করিয়াছি এবং আমার বহু ছাত্র-ছাত্রী এই কৌশলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি দেখিয়াছি যে, "অটো সাজেস্‌সান্ মেথড্" দ্বারা যত সহজে শারীরিক, মানসিক ব্যাধি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করা যায়—এমন আর কোন কিছুতেই হয় না। শিক্ষার্থী নিম্নোলিখিত অনুশীলনগুলি একটী একটী করিয়া অভ্যাস করিবেন, কখনও এক সময়ে একাধিক

বিষয় লইয়া চেষ্টা করিবেন না। কিংবা একটী সহজ কার্য্য সম্পূর্ণ-রূপে সাফল্যলাভ না করিয়া কোন কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। শিক্ষার্থী—এই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পর, একনিষ্ঠভাবে সাধনায় রত থাকিবেন, এবং সাধনা ও সিদ্ধির বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবেন না। মনে রাখিবেন, সাধনার বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিলে সিদ্ধিলাভের বিঘ্ন ঘটে, এজন্য তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যত্নের সহিত সর্ব্বদা গোপন রাখিতে হয়।

ইচ্ছাশক্তি জাগ্রতকরণ

কোন একটী ভাবকে চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিলে, মন তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আমাদের মন—নরম মাটির মত। নরম মাটিকে গড়িয়া-পিটিয়া ইচ্ছামত উহাকে যে কোন বস্তুতে, যেমন, হাড়ী, ঘটী, কলস ইত্যাদিতে পরিণত করা যায়, তদ্রূপ আমাদের মনকেও "অটোসাজেস্সন্ দ্বারা" ইচ্ছামত গঠন করিতে পারা যায়।

ইচ্ছাশক্তি লাভাকাঙ্ক্ষীকে সর্ব্বপ্রথমেই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থাবান হইতে হইবে। তাহার হৃদয়ে যে ইচ্ছাশক্তি সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান আছে, এবং যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ঐ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া উহাদ্বারা জগতের ও নিজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে—এই সত্যবাক্যে সর্ব্বদা দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

১নং অনুশীলন

অর্দ্ধ ফুলস্কেপ সাইজের অর্থাৎ ১৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৮ ইঞ্চি প্রস্থের একখানা সাদা কাগজে, উজ্জ্বল কালীতে খুব পরিষ্কার ও বেশ বড় বড় অক্ষরে লিখিবেন, যথা :—

আমার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং আমি আমার এই ইচ্ছাশক্তি বলে যে কোন কার্য্য করিতে পারি। তৎপর দিবা-রাত্রির মধ্যে যতবার পারা যায়, বার বার ঐ কাগজখানা সামনে রাখিয়া খুব মনোযোগের সহিত উহা এক একবার পাঠ করিবেন এবং স্থিরমনে ২।৩ মিনিট-কাল মন্ত্রটী মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। যখন উহা মনে মনে আবৃত্তি করিবেন—তখন অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিবেন না, শুধু ঐ মন্ত্রটীর বিষয় একাগ্রমনে ভাবিবেন এবং সত্যসত্যই দৃঢ় বিশ্বাস করিবেন যে, বস্তুতঃ আপনার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং আপনি উহার সাহায্যে যে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। মনে মনে আবৃত্তি করিবার সময়—উহার সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিবেন। এইভাবে দিন-রাত্রের মধ্যে যত বেশীবার পারেন এমন কি ১০০।১৫০ বার পর্য্যন্ত দিনে-রাত্রে উহা অভ্যাস করিবেন। শুধু কেবল পাখীর মত মুখে আওড়াইয়া গেলেই হইবে না—মনে মনে আবৃত্তি করা এবং আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উহাকে একাগ্র মনে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যখন উহা করিবেন না—তখন কাগজখানাকে ভাঁজ করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য নিজের নিকট রাখিবেন। কোন কোন গ্রন্থকার "ঐরূপ ৮।১০ খানা কাগজে লিখিয়া নিজের থাকিবার বা শয়ন কক্ষের দেওয়ালে লাগাইয়া

রাখিতে বলেন এবং যখনই ঘড়ে প্রবেশ করেন, তখনই ঐ গুলির দিকে বেশ মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক একাগ্র মনে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উহা পাঠ করিতে বলেন।" অতঃপর, রাত্রিতে শয়ন করিয়া ঐ কাগজখানার প্রতি তাকাইয়া ২।৪ মিনিট কাল ঐ মন্ত্রগুলি পাঠ করিবেন এবং চক্ষু বুজিয়া মন্ত্রটী খুব একাগ্র মনে আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে সত্য বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবেম। ঐরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া ঘুমাইয়া পড়ার বিশেষ ফল আছে। কারণ ঐরূপ দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলে—মন নিদ্রিতাবস্থায় উক্ত আদেশ মন্ত্রের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে রত থাকে—উহাতে ঐ ভাবটী হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। রাত্রিতে কোন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে অমনি ঐ মন্ত্রটী মনে মনে আবৃত্তি করিবেন এবং উহাকে সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা পোষণ করিবেন।

এইভাবে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ২।৩ সপ্তাহকাল উহা অভ্যাস করিবেন এবং দেখিতে পাইবেন যে, ঐ ভাবটী আপনার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে। যদি ২।৩ সপ্তাহ অভ্যাসের ফলেও ঐরূপ ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল না হয়, তবে আর কিছুদিন অনুশীলনটী অভ্যাস করিতে হইবে। ফলতঃ ২।৩ সপ্তাহ মধ্যেই উহার প্রতি নিজের বেশ আস্থা জন্মিয়া থাকে এবং প্রাণে এক নূতন উৎসাহ, উদ্যম অনুভব হইয়া থাকে। যখন উহা অনুভব হইবে তখন ২নং অনুশীলনটী অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

২নং অনুশীলন

১নং অনুশীলন অনুযায়ী কার্য্য অভ্যাস কবার পর যখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে সত্যসত্যই আপনার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং উহার সাহায্যে আপনি যে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন (প্রকৃতই ২।৩ সপ্তাহ অভ্যাসের ফলেই মনে ঐরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে—ইহা সত্য) প্রথম প্রথম খুব সহজ কাজ, যাহা সম্পন্ন করিতে বেশী যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম বা সময় আবশ্যক হইবে না—এমন কার্য্য পছন্দ করিয়া লইয়া আপনার ইচ্ছাশক্তি বলে উহা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবেন। যেমন—১০।১৫ মিনিটকাল কোন একটা পদার্থের প্রতি দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ করিয়া রাখা, বা ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কোন বহির ১ পৃষ্ঠা নকল করা কিম্বা ৪।৫ লাইন মুখস্থ করা। অথবা মনে করুন, ১৫।২০ মিনিট মধ্যে ১ মাইল গমন করা ইত্যাদি। প্রথমতঃ ঐ ভাবের কোন একটি কার্য্য মনোনীত করিয়া লইয়া—মনে মনে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত চিন্তা করিবেন যে, "আমার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রখর হইয়াছে, সুতরাং এই শক্তি বলে ঐ কার্য্যটী আমি ঐ সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিতে পারিব। কোন বাধা বিঘ্নই আমাকে উহা হইতে বিরত করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব।" এই ভাবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া খুব আনন্দ মনে কার্য্যটী আরম্ভ করিবেন এবং যাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে কার্য্যটী সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি খুব মনোযোগ রাখিবেন—অর্থাৎ যেমন তেমন ভাবে, কোন প্রকারে কার্য্যটী নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন না,

এবং যতক্ষণ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ততক্ষণ মাঝে মাঝে "আমার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রখর ইত্যাদি মন্ত্রটী" দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। অর্থাৎ মনে মনে আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সত্য সত্যই ধারণা করিবেন যে, আপনার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রখর এবং ঐ শক্তি বলে উক্ত কার্য্যটী নিশ্চয়ই যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিলে আপনার মন উক্ত কার্য্যের প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। যখন কার্য্যটী শেষ হইবে তখন আপনি এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখিবেন যে, আপনার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ঐ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইল। ২।৩ সপ্তাহ ঐরূপ অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবার পর শিক্ষার্থী যখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে; তাহার ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব হইতে থাকিবে এবং তিনি পরম উৎসাহের সহিত তখন পরবর্ত্তী অনুশীলনগুলি অভ্যাসের চেষ্টা করিবেন।

৩নং অনুশীলন

আমাদের আনন্দজনক বা লোভজনক কার্য্যে স্বভাবতঃই মন লিপ্ত থাকিতে চায় কিন্তু অপ্রীতিকর কার্য্যে সহজে মন সংলগ্ন হইতে চায় না; এজন্য, ইচ্ছাশক্তি বলে মনকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিতে হয়। ১নং, ২নং অনুশীলন অভ্যাসে শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তি ও মনের বল নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে—সুতরাং এইবার সে তাহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইবে যাহা একঘেয়ে রকমের বা বিরক্তিকর বা যে কার্য্যে তাহার মনের তেমন স্পৃহা বা আগ্রহ নাই।

দৃষ্টান্ত—যেমন, অর্দ্ধঘণ্টা সময় সম্পূর্ণ স্থির ও নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া থাকা, অথবা একখানা হস্ত স্কন্ধ বরাবর সাম্‌নের দিকে টান করিয়া রাখিয়া এবং মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ১০ মিনিটকাল শূন্যের উপর রাখা। ১ হইতে ১০০০ কিম্বা ২০০০ পর্য্যন্ত গণনা করা ঐবং পুনরায় ১০০০ হইতে উল্টা দিকে ১ পর্য্যন্ত গণনা করা কিংবা প্রতি পদক্ষেপে গণনা করিতে করিতে ১ পোয়া মাইল বা অর্দ্ধ মাইল পথ গমন করা ইত্যাদি রকমের বহু কার্য্য শিক্ষার্থী নিজের বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিয়া উহা সম্পন্ন করিতে অভ্যাস করিবেন। এই প্রকারের কার্য্য সুচারুরূপে নিস্পন্ন করিতে শিক্ষার্থীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক একাগ্রতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক হইবে, সুতরাং ঐ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থী বেশ দৃঢ়তার সহিত মনে মনে ভাবিয়া লইবেন যে, তাহার ইচ্ছাশক্তি খুবই প্রখর, এই ইচ্ছাশক্তির বলে সে নিশ্চয়ই ঐ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে। শিক্ষার্থী প্রত্যহ কিছুদিন নিয়মিতরূপে ঐ রকমের ৩।৪টি কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অভ্যাস করিবে। এইভাবে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তি ও মনের বল স্বভাবতঃই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইবেই হইবে। এখন শিক্ষার্থী লক্ষ্য করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে ১নং অনুশীলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে 'তাহার ইচ্ছাশক্তির বল যাহা ছিল তাহার তুলনায় এখন তাহার ইচ্ছাশক্তি অনেক প্রখরতা লাভ করিয়াছে। এখন সে নিম্নোক্ত অনুশীলনটী অভ্যাস করিবে।

৪নং অনুশীলন

উপরোক্ত অনুশীলনগুলি নিয়মিতরূপে ৩।৪ সপ্তাহ অভ্যাস করিলে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, চিত্তের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা প্রভৃতি অন্তরের বৃত্তিগুলি বর্দ্ধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাশক্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়ই তীব্রভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। এখন শিক্ষার্থী তাহার বর্দ্ধিত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাহার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইবে। কারণ ইচ্ছাশক্তির প্রখরতার সঙ্গে মানসিকশক্তি বৃদ্ধি হইলে জগতের যে কোন কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। মানসিকশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে সর্ব্বাগ্রে সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। আজকাল অধিকাংশ লোকই জীবনের প্রথম হইতেই মিথ্যাবাদী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে দেখা যায়। এই দুইটী ইচ্ছাশক্তি ও মনের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। এজন্য যাহাতে সত্যবাদী হয় ও ইন্দ্রিয়াসক্ত না হয় তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তিকে সেই দিকে চালিত করিতে হইবে। সত্যবাদী হইবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিম্নোক্তরূপ কার্য্য করিবে। যথা ঃ—

একখানা সাদা কাগজে বড় বড় অক্ষরে ও পরিষ্কার মত লিখিবেন "আমি সর্ব্বদা সত্যকথা বলিব, আজ হইতে আমি মিথ্যাকথা ও মিথ্যা ব্যবহার ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিলাম। আর আমি কদাচই মিথ্যাকথা বলিব না।"

তারপর ১নং অনুশীলনের মত ২।৩ সপ্তাহ ঐ ভাবে কার্য্য করিবে, অর্থাৎ দিনের মধ্যে যত বেশীবার পারেন—এই সত্যকথা

বলিবার মন্ত্রগুলি একাগ্রতার সহিত মনে মনে আবৃত্তি করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই সত্যবাদী হওয়ার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। কিছুদিন এরূপ করিলেই দেখিবেন আপনার সত্যকথার ও সত্য ব্যবহার করিবার অভ্যাস জন্মিতেছে। পূর্ব্বে হয়ত অনেক সময়ই গল্প ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যকথা বলিয়াছেন ও মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু এখন নিজেই নিজের ব্যবহারে বিস্মিত হইবেন যে—এখন ভুলেও মিথ্যাকথা মুখে আসে না। যদি ২।৩ সপ্তাহেই সত্যকথা বলিবার অভ্যাস পূর্ণ মাত্রায় না হইয়া থাকে, তবে যতদিনে উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ব না হয় ততদিন ঐ ভাবে কার্য্য করিবেন। ফলতঃ ২।৩ সপ্তাহের বেশী বড় লাগে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। তারপর, ইন্দ্রিয় পরায়ণ না হইবার জন্য বা কামাসক্ত না হইবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন এবং উপরোক্ত প্রণালীতে ১ খানা সাদা কাগজে লিখিয়া লইবেন যে,—

১। "আমি আর কখনও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিব না। আর কখনও হস্তমৈথুন করিব না। এই ঘৃণিত অভ্যাসকে আমি চিরকালের নিমিত্ত দূর করিব। এই কু-অভ্যাস আমার শরীর ও মনের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকারী। সুতরাং এই কু-অভ্যাসকে আমি আজ হইতে পরিত্যাগ করিলাম। আমি নিশ্চয়ই আর কখনও হস্তমৈথুন করিব না।"

২। "আমি সর্ব্বপ্রকার কামচিন্তা হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিব। প্রত্যেক মেয়েলোককে আমি আমার মায়ের মত মনে করিব। সুতরাং কোন স্ত্রীলোককে কি জাগ্রতাবস্থায় কি নিদ্রিতা-বস্থায় দর্শনে আমার অন্তরে কামভাব জাগিবে না। আমি স্বপ্নেও

কোনও স্ত্রীলোককে মাতৃভাব ব্যতীত অন্যভাবে দর্শন করিব না— সুতরাং নিদ্রাবস্থায় কখনও আমার শুক্রস্খলন হইবে না।”

ঐ ভাবে ২খানা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিয়া প্রথমটী ২।৩ সপ্তাহ অনুশীলনের পর যখন দেখিতে পাইবেন যে, সত্যসত্যই আপনার ঐ ঘৃণিত অভ্যাসটী দূর হইয়াছে, তখন দ্বিতীয় অনুশীলনটী অভ্যাস করিবেন। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, যে কোন কার্য্য অনুশীলন কালীন, মনে মনে আবৃত্তি করায় সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন।

উপরোক্ত নিয়মে কাম, ক্রোধ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি যে কোন অসৎবৃত্তি দমন করিতে ইচ্ছুক—তাহার জন্যে ঐ একই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে। আর একটী কথা এই যে, যখন যে কার্য্য অভ্যাস করিবেন—সে সম্বন্ধে রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মনে মনে উহা আবৃত্তি ও ঐ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে করিতে নিদ্রা যাইবেন। ইহাতে খুব দ্রুত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

ইচ্ছাশক্তি বলে—অপরকে অজ্ঞাতসারে বশীভূত করার কৌশল।

ইচ্ছাশক্তি বলে দুরস্থ, এমনকি, বিদেশের কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাহার অজ্ঞাতসারে বশীভূত করতঃ তাহার দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। শিক্ষার্থী কোন অসৎ

উদ্দেশ্যে কদাপি এই কার্য্য করিবেন না—তাহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রখরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে।

একটি নির্জ্জন গৃহে কোন আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিবেন। অতঃপর দেহস্থ মাংসপেশীগুলিকে যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া চক্ষু বুজিয়া, যে ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার ইচ্ছা, তাহার আপাদমস্তক চেহারাখানা স্পষ্টরূপে মনে মনে ১৫।২০ মিনিটের জন্য দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিবেন এবং ঐ চেহারা ভিন্ন মনে তখন আর কোন কিছুই ভাবিবেন না। ১৫।২০ মিনিট ঐরূপ চিন্তার পর যখন মনোনীত ব্যক্তির চেহারা শিক্ষার্থীর মানষনেত্রে অবিকল উদয় হইবে তখন (যেন অভীষ্ট ব্যক্তি একেবারে সশরীরে তাহার নিকট উপস্থিত আছে এরূপ দৃঢ় কল্পনা করিয়া) শিক্ষার্থী দৃঢ়তার সহিত ঐ ব্যক্তিকে মনে মনে আদেশ করিবেন। কোন্ কার্য্যের জন্য কিরূপ আদেশ দেওয়া আবশ্যক নিম্নে উহার ২।১টী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিক্ষার্থী ঐ নমুনার অনুরূপ উপযুক্ত আদেশের সাহায্যে তাহা দ্বারা ইচ্ছামত যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। যখন শিক্ষার্থী অভীষ্ট ব্যক্তিকে কার্য্য সম্পাদনের জন্য আদেশ দিবেন তখন ঐ ব্যক্তির আকৃতি খুব স্পষ্টরূপে শিক্ষার্থীর মনে উদিত হওয়া চাই এবং আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ় ভাব থাকা চাই যে, ঐ আদেশ অভীষ্ট ব্যক্তি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছে এবং নিশ্চয়ই সে ঐ আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে। এইরূপ মনের দৃঢ়তা শিক্ষার্থীর থাকা চাই, তবেই উহা সমধিক কার্য্যকরী হইবে।

প্রথম প্রথম শিক্ষার্থী কয়েক দিন ঐরূপ আদেশ প্রদানের পর কৃতকার্য্য হইবেন। অর্থাৎ প্রথমেই যে একদিনেই কৃতকার্য্য

হইবেন, সেইরূপ আশা করিবেন না। তবে মনের একাগ্রতা ও আদেশের দৃঢ়তা হইলে একদিনের আদেশেই কৃতকার্য্যতা আসিতে পারে—ফলতঃ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়। পরে, ঐরূপ ২।৪টী কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করার পর, শেষে একবার আদেশেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে অপর যে কোনও ব্যক্তিকে তাহার অজ্ঞাতসারে বশীভূত করিয়া ঈপ্সিত মত কার্য্য করাইবার এমন উৎকৃষ্ট পন্থা আর নাই। ইহা দ্বারা ন্যায়সঙ্গত কোন মোকদ্দমার পক্ষে বিচারককে রায় দিতে বাধ্য করা যায় কিংবা কোন ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শান্ত করিতে, কোন বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের মত পরিবর্ত্তন করিতে, কাহারও মনে নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে, অমনোযোগী ছাত্রের লেখাপড়ায় মনোযোগ আনিতে, অশান্ত প্রকৃতির ছেলেকে শান্ত করিতে, দেনাদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে এই কৌশল অব্যর্থ কার্য্যকরী।

শিক্ষার্থী কেবল সদুদ্দেশ্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইলে, এই বিষয়ে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা লাভ হইবে এবং সে নিজের ও অপরের বহু বিষয়ের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইবে। তবে এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত, খুব একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে মানসনেত্রে অভীষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা সহজকার্য্য নহে। সেইজন্য শিক্ষার্থী একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার পর ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, অন্যথায় উহাতে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।

একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার সহজ অনুশীলন নিম্নে প্রদত্ত হইল। তৎপূর্ব্বে উল্লিখিত কোন্ কার্য্যের জন্য কিরূপ আদেশ দিতে হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

(১) অমনোযোগী ছাত্রের লেখাপড়ায় মনোযোগ আনিতে হইলে—নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(কল্পনাদ্বারা অভীষ্ট ছাত্রকে বা বালককে একেবারে সম্মুখে দেখিতেছেন—সুতরাং তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া বলিবেন) "হরেন! তুমি আজ হইতে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী হইবে। আজ হইতে প্রতিদিন প্রাতে হাতমুখ ধুইয়াই তাড়াতাড়ি করিয়া ধীর, স্থির, শান্ত মনে পড়িতে বসিবে এবং খুব মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ৩ ঘণ্টা, সন্ধ্যার পর ২ ঘণ্টা পড়াশুনা করিবে। ঐ সময় একমাত্র পড়াশুনা ভিন্ন অন্য কোন কিছু কার্য্য করিতে পারিবে না —বা অন্য কোন বিষয় মন দিতে পারিবে না। সাবধান। বুঝিলে? হরেন! আজ হইতে তুমি প্রত্যহ রীতিমত পড়াশুনা করিবে এবং খুব মনোযোগ দিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করিবে।"

(২) কাহারও মন হইতে শত্রুতা দূর করিবার জন্য বলিবেন—

"অতুল! তুমি আজ হইতে আমার (বা রামের) সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতা আচরণ করিবে না। আজ হইতে তুমি আর কোন বিষয়েই আমার (বা রামের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তুমি আমার (বা রামের) প্রতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ ভাব—সর্ব্বপ্রকার

হিংসা ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার (বা রামের) একান্ত বন্ধুরূপে পরিণত হইবে এবং আমার (বা রামের) সহিত সর্ব্বদা সরল, সত্য ও সদয় ব্যবহার করিবে। অতুল! মনে রাখিও, তুমি আজ হইতে আমার (বা রামের) সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতা আচরণ করিতে পারিবে না। আজ হইতে তুমি আমার (বা রামের) বন্ধু।"

(৩) দেনদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে বলিবেন—

"যদু! তুমি যে গত শ্রাবণ মাসে (যে তারিখ বা যে মাসে বা যে বৎসরে টাকা ধার নিয়াছে—সেই তারিখ, মাস ইত্যাদি উল্লেখ করিবেন) ১৫ই তারিখ আমার (বা গোপাল বাবুর) নিকট হইতে ১০৲ টাকা ধার নিয়াছ—সেই টাকা কয়টী তুমি অতি অবশ্যই আজ হইতে ৭ দিনের মধ্যেই আমাকে (বা গোপাল বাবুকে) শোধ দিয়া দিও। আমার (বা গোপাল বাবুর) টাকার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি যে ভাবে পার, ঐ টাকা ৭ দিনের মধ্যে দিয়া দিবে—নিশ্চয়ই দিবে। ৭ দিনের মধ্যেই আমি (বা গোপাল বাবু) ঐ ১০৲ টাকা চাই-ই। তোমাকে ৭ দিনের মধ্যেই টাকা দিতেই হবে।"

উপরে কি ভাবে অভীষ্ট ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে হয় তাহার নমুনা দেওয়া হইল। সাক্ষাৎ মতে আমরা যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার, সম্বোধন বা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি—আদেশ করিবার সময়ও সেইরূপ ভাবে ব্যবহার, সম্বোধন বা কথাবার্ত্তা বলিবেন। তবে এই আদেশ প্রদানের মধ্যে যেন বেশ একটা গম্ভীর ভাব থাকে এবং ঐ আদেশ যে প্রকৃতই সত্য, এই ভাব যেন

প্রকাশ পায়। কোন প্রকার নকল বা কৃত্রিম ভাব যেন মনে না আসে। এবং আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে দৃঢ় ভাব থাকে যে, যাহা আদেশ করা হইল—ঐ ব্যক্তি তাহা অতি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছে এবং যেন সে এমন ভাব দেখাইল যে, সে আদেশ মতই কার্য্য করিবে।

এতদ্ব্যতীত যদি কখনও সাক্ষাৎ মতে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়, তখনও তাহাকে * সাক্ষাৎ মতে নম্রভাবে ঐরূপ বলিবেন। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, যদি কল্পনার সাহায্যে মানস-নেত্রে অভীষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া দৃঢ় ও সত্য ভাবে একাগ্রতার সহিত আদেশ করা যায়, তবে, তৎপর, কখনও তাহার সহিত দেখা হওয়ার পর যখন তাহাকে আবার সাক্ষাৎ মতে ঐ কথা বলিবেন তখন দেখিবেন, ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিবে "হাঁ, মহাশয়, আপনার টাকা কয়টী শীঘ্রই দিয়া দিব, আমিও ২।৩ দিন হইল ভাবিয়াছি যে, আপনার টাকা কয়টী যে ভাবেই হউক সংগ্রহ করিয়া সত্বরই দিয়া দিব।"

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন যে, ঐ ব্যক্তি যে বলিল, "২।৩ দিন হইল—আমিও ভাবিয়াছি"। সেই ২।৩ দিন সম্বন্ধে বলি—আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আপনি যেদিন হইতে আদেশ দিতেছেন, সেদিন হইতেই অভীষ্ট ব্যক্তির মনেও ঐ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বেশ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

---

* যদি সাক্ষাৎ মতে বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয় তবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া (সাক্ষাৎ মতে) মনে মনে আদেশ করিবে।

কার্য্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অন্ততঃ দৈনিক ২ বার (প্রাতে ও সন্ধ্যার পর) ঐরূপ আদেশ দিতে হয়। ফলতঃ যত বেশী বার আদেশ দেওয়া যায়, তত শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এরূপ আদেশ যে কেবল মানুষের উপরই ক্রিয়া করিতে সক্ষম, তাহা নয়, উহা ইতর প্রাণী যেমন পশু, পক্ষীর উপরও সমান ভাবেই ক্রিয়া করিয়া থাকে। মনে করুন, আপনার বাড়ীতে একটি কুকুর আছে উহার নাম, "জ্যাকি"। কুকুরটী খুব দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, খুব হিংস্র স্বভাব, বাহিরের ও নিজ বাড়ীর অনেককে সে কামড়াইয়াছে। তাহার এই স্বভাব পরিবর্ত্তন হইলে, সকলের পক্ষেই শান্তির কারণ হয়। এমতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উহাকে কয়েকদিন আদেশ করিলে এবং সাক্ষাৎ মতেও উহার গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়তার সহিত উহাকে আদেশ করিলেই—নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন জ্যাকির ঐ মন্দ অভ্যাস দূরীভুত হইয়াছে—ইহা পরীক্ষিত সত্য।

বিদেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ আদেশ করিতে সেই ব্যক্তির চেহারা জানা না থাকিলে অর্থাৎ কোন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ঐরূপ কার্য্য করিতে, সেই ব্যক্তির ফটো দর্শনে কার্য্য করিতে হয়—নিম্নে এই সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার কৌশলটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার কৌশল।

১নং অনুশীলন

(একাগ্রতাশক্তির ও দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা)

৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও ৪ইঞ্চি দৈর্ঘ্য একখানা সাদা কাগজের ঠিক মধ্যস্থলে একখানা আধুলীর পরিমাণ গোল করিয়া কাল কালিদ্বারা একটী চক্র আঁকিবেন। ঐ গোল চক্রটীর সমুদয় স্থানটীই কালি-দ্বারা অঙ্কিত করিবেন। অতঃপর কাগজখানা অন্য আর একখানা মোটা কাগজ যেমন, পিজ্‌বোর্ড বা টীনের সঙ্গে আঠাদ্বারা লাগাইয়া ঘরের বেড়া বা দেওয়ালের বা খুঁটীর এমন স্থানে কাগজখানা লট্‌কাইয়া রাখিবেন যেন পরিষ্কার মত একটু দূর হইতে উহা দেখা যায়। তৎপর প্রাতে ও বৈকালে (সন্ধ্যার পর নহে) স্থির মনে উপবেশন করিয়া বা দাঁড়াইয়া ঐ চক্রটীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবেন। তখন অন্যকোন চিন্তা, ভাবনা মনে আনিতে পারিবেন না। কেবল ঐ চক্রটীর প্রতি দৃষ্টি এবং চক্রটীর বিষয়ই চিন্তা করিবেন। প্রথম প্রথম অল্পক্ষণ পরেই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিবে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকিবে। তখনই কয়েক সেকেণ্ড চক্ষু বুজিয়া থাকিবেন এবং পুনরায় ঐরূপ করিবেন। প্রথম প্রথম বেশী সময় ঐরূপ করিতে পারিবেন না বা করাও সঙ্গত নয়। আস্তে আস্তে সহ্যমত ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয় এবং সময় বাড়াইতে হয়। ভালমত ধৈর্য্য সহকারে প্রত্যহ ইহা অভ্যাস করিলে—ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন ১ ঘণ্টা কিংবা তদপেক্ষা বেশী সময়ও ঐ স্থানে মন আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। প্রথম প্রথম ৫।৭ মিনিট করিয়া অভ্যাস

করিতে হয়। আস্তে আস্তে সময় বাড়াইতে হয়। যেমন, ১ সপ্তাহ কাল ৫ মিনিট করিয়া অভ্যাস করিলেন, তৎপর সপ্তাহে আরও ৫ মিনিট বাড়াইলেন অর্থাৎ ১০ মিনিট অভ্যাস করিলেন। এই ভাবে অভ্যাস করিতে হয়। ইহাতে মনের **একাগ্রতাশক্তি** অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর **দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা** জন্মিবে।

২নং অনুশীলন

(একাগ্রতা শক্তির ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা)

রাত্রিতে শুইতে যাইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে কার্য্য করিবেনঃ—

চিৎভাবে শয়ন করিয়া হস্ত দুইখানা দুই পাশে ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দেহটীকে যথাসাধ্য শিথিল ও অসাড় করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর ২।১ মিনিট খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবেন। তৎপর দেহের ঐ শিথিল অবস্থাতেই—প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শুইতে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু কার্য্য (শারিরীক, মানষিক এবং সৎ অসৎ) সম্পন্ন করিয়াছেন—সেই সবগুলি যথাক্রমে চিন্তা করিবেন। নির্ভুলরূপে একটীর পর একটী যথাক্রমে ঐ কার্য্যগুলি মনে মনে চিন্তা করিবেন। প্রথম প্রথম হয়তঃ দেখিবেন যে, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রে শুইতে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ভাবে শারিরীক, মানষিক, সৎ অসৎ কার্য্যগুলি একটীর পর একটী করিয়াছেন—ঠিক সেই ভাবে—ধারাবাহিকরূপে—অর্থাৎ যথাক্রমে কার্য্যগুলি মনে মনে আবৃত্তি করিতে সক্ষম হন নাই; ঘোলাইয়া যাইতেছে কিংবা উহা চিন্তা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে

নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছেন, অর্থাৎ অনুশীলনটী শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই নিদ্রাকর্ষণ হয়। প্রথম প্রথম দুইটী বিষয়ই অক্ষমতা ধরা পড়িবে। ১। ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিতে না পারা। ২। অনুশীলনটী যথামত সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়া। এই দুইটী অক্ষমতাকেই অভ্যাস দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। মনে মনে আবৃত্তি করিবার কালীন, উহা উল্টাপাল্টা না হয় এবং অনুশীলনটী শেষ হওয়ার আগে নিদ্রাকর্ষণ না হয়—এই দুইটী বিষয়ের প্রতি তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষার্থী এই অনুশীলনটী ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে যথানিয়মে নিয়মিত কিছুদিন অভ্যাস করিলেই—দেখিতে পাইবেন যে তাহার স্মৃতিশক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩নং অনুশীলন

১নং ও ২নং অনুশীলন দুইটী অভ্যাস করিবার পর এই ৩নং অনুশীলনটী অভ্যাস করিবেন। ইহাতেও একাগ্রতা ও স্মৃতি,—এই উভয়শক্তিরই প্রখরতা জন্মিবে। কোন দেবতার একখানা ছবি সংগ্রহ করিয়া লইবেন (ছবিখানা যত বড় হয় ততই ভাল)। অতঃপর ছবিখানা নিজের সম্মুখে ধরিয়া—বেশ ধীর, স্থির, শান্তভাবে বসিয়া একান্ত ও একাগ্রমনে ছবিখানার আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিবেন। তৎপর চোখ বুজিয়া ঐ ছবিখানার আদ্যোপান্ত মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিবেন। চিন্তা করিবার সময় অগ্রে মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে চিন্তা করিবেন। প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—একটির পর একটি করিয়া চিন্তা করিতে থাকিবেন।

প্রথম প্রথম চিন্তা করিবার সময় যদি কোন প্রকার ভুল হয় তবে, চোখ মেলিয়া ছবিখানা বেশ করিয়া আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিয়া প্রথম হইতে অর্থাৎ মাথা হইতে চিন্তা করিতে থাকিবেন। এইভাবে ধৈর্য্যসহকারে প্রতিদিন প্রাতে একবার এবং বৈকালে বা রাত্রে একবার —এই দুইবার করিয়া ঐরূপ অভ্যাস করিবেন। ছবিখানা যদি বিভিন্ন বর্ণ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে তবে উহা মনে মনে চিন্তা করিবার কালীন যে অঙ্গে বা যেখানে যে বর্ণ আছে—সেই সেই স্থানের সেই সেই বর্ণের বিষয়ও মনে মনে আবৃত্তি করিবেন।

এই ৩নং অনুশীলনটীই অপেক্ষাকৃত কঠিন। সুতরাং শিক্ষার্থী নিয়মিতরূপে যতদিনে ইহা সম্পূর্ণ ভাবে অভ্যাস না হয় ততদিন যথেষ্ট ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে ইহা অভ্যাস করিবেন। এই অনুশীলনটী সুন্দররূপে অভ্যস্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থী কোন ব্যক্তি বিশেষের পূর্ণ চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া ৫।৭ মিনিট বা তদূর্দ্ধকাল মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে অভ্যাস বা চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি ইহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন, তখনই দূরস্থ বা বিদেশস্থ কোনও স্ত্রী, পুরুষকে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে মানসপটে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত অটো-সাজেস্সান (Auto-suggestion) দ্বারা ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা পরীক্ষিত সত্য। ক্রমে শিক্ষার্থীর মানসিকশক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইবে যে, সে উহাদ্বারা নিজের নানাপ্রকার শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিবেন। শিক্ষার্থী তখন একাগ্রতা সহকারে নিজের প্রতি নিজে যখন যাহা

আদেশ করিবেন—মন ঠিক তখন তাহা মানিয়া লইতে বা করিতে বাধ্য থাকিবে। মনে করুন, শিক্ষার্থী কোন কার্য্যপোলক্ষে বাটী হইতে বাহির হইয়া বা বেড়াইবার উপলক্ষে হাটে, বাজারে বা আফিসে গিয়াছেন। গন্তব্য স্থানে যাইয়া বা পথেই তাহার হঠাৎ অন্য কোন একটা অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যের বিষয় মনে হইল। বিষয়টী এমনই জরুরী যে অন্ততঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কার্য্যটী না করিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে—কিন্তু এখন নানা কার্য্যের চাপে বাড়ীতে যাইবার পর উহা করিতে মনে থাকিবে কিনা, সে বিষয় তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। অর্থাৎ বাড়ীতে যাইতে যাইতে উহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায়, শিক্ষার্থী যখনই ঐ কার্য্যের কথা মনে হইল, তখনই একটু সময় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া একাগ্রমনে চিন্তা করিবে যথা ঃ—

"আমার ইচ্ছাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। আমার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর যে, বাড়ী যাইয়া আমি (অমুক) কাজটী করিতে ভুলিব না। এখন যতপ্রকার কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন, কিছুতেই উহা ভুল হইবে না। আমি বাড়ীতে যাওয়া মাত্রই সেই কাজটীর বিষয় (সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যটীর বিষয় ভাবিবেন) আমার মনে পড়িবে—নিশ্চয়ই মনে পড়িবে। আমার কদাচই উহা ভুল হইবে না। আমি বাড়ী যাইয়াই উহা সম্পন্ন করিব। আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। আমি উহা ভুলিব না।" এইভাবে নিজের প্রতি নিজে একাগ্রমনে ২।৪ বার আদেশ করিয়া তখনকার মত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাইবেন। বাহিরের কাজগুলি সম্পন্ন করিবার সময়ে মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসিয়া সেই কাজটী করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মে

নিজের প্রতি নিজে একাগ্রমনে ২১ বার করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন। দেখিবেন, বাহিরে আপনার হাজার কাজ থাকুক, এমনকি, ২১ বার একাগ্রতার সহিত আদেশ প্রদানের পর যদি কাজের চাপে—আর আদেশ প্রদানে করিতে ভুলিয়াও যান, তবুও দেখিবেন, বাড়ীতে আসামাত্র আপনার সেই কাজটীর কথা স্মরণ পড়িবে।

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের জন্য এইরূপ "অটো সাজেস্‌সান" প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা শতাধিক স্কুল ছাত্রছাত্রীর ও বালকবালিকার, এমনকি, বয়স্ক ব্যক্তিদেরও স্মরণশক্তি আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াছি।

ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে দূর চিকিৎসা।

(Distant Healing by Will Power)

দূরে কিংবা বিদেশে অবস্থিত রোগীকে না দেখিয়া—রোগীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে চিকিৎসা ও আরোগ্য করাকে ইংরাজীতে "ডিস্‌ট্যান্ট্‌ হিলিং" (Distant Healing) বা "অ্যাবসেন্ট্‌-ট্রিটমেন্ট" (Absent Treatment) কহে। সাধারণ কথায় ইহাকেই আমরা "দূর-চিকিৎসা" বলিয়া কহিয়া থাকি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এইরূপ চিকিৎসায় নানাবিধ জটীল ও পুরাতন রোগ (chronic diseases), বিশেষতঃ মানসিক ও নৈতিক রোগ সমূহ আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য করা যায়। ইহাতে বিশেষ কোন আড়ম্বর বা সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। রোগী যেখানে

এবং যে অবস্থাতে থাকুক না কেন—ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে—রোগীর রোগ আরোগ্য হইবেই হইবে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই প্রথায় চিকিৎসা প্রণালী বিদ্যমান আছে।

এই প্রকারের চিকিৎসা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে ঃ--

১। শিক্ষার্থী পূর্ব্বোল্লিখিত মনের একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধির পর দূরস্থ বা বিদেশস্থ কোন রোগীর রোগ আরোগ্য উদ্দেশ্যে ধীর স্থির ভাবে বসিয়া সর্ব্বপ্রথম চোখ বুজিয়া একাগ্রমনে রোগীর চেহারা চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং মনে করিবেন যেন, সত্যসত্যই রোগী একেবারে শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপবিষ্ট বা দাঁড়ান আছে। এই ভাবে রোগীর আপাদমস্তক একাগ্রমনে ৫।.০ মিনিট চিন্তা করতঃ—রোগীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া (চোখ বুজিয়া এবং রোগীকে একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে) তাহার রোগ আরোগ্য উদ্দেশ্যে দৃঢ় সত্য জ্ঞানে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবেন। রোগ আরোগ্য উদ্দেশ্যে রোগীর প্রতি আদেশ প্রদান কালীন শিক্ষার্থী দৃঢ় সত্যজ্ঞান রাখিবেন যে, তিনি যাহা আদেশ দিতেছেন, সেই আদেশের ফলে ঐ রোগীর রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহাতে যেন শিক্ষার্থীর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে। তবেই উহা সমধিক কার্য্যকরী হইবে—নতুবা শুধু আদেশগুলি মুখে আওড়াইয়া গেলেই কোন ফল হইবে না। এই যে দৃঢ় সত্যজ্ঞান, ঐ যে আত্মবিশ্বাস—উহাই ইচ্ছাশক্তি।

রোগ আরোগ্যার্থ আদেশ প্রদান।

মনে করুন, আপনার রোগী ২ বৎসর যাবৎ বারংবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইতেছে এবং তজ্জন্য তাহার প্লীহা লিভারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাকে আরোগ্য করিতে নিম্নোক্ত প্রকারে আদেশ দিবেন। রোগীর নাম সম্বোধন করিয়া দৃঢ় সত্যজ্ঞানে বলিবেন, "জীবনবাবু,—আজ হইতে আপনার আর জ্বর হইবে না, আপনার জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। আপনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আর আক্রান্ত হইবেন না। এখন হইতে আপনার আর শীত, কম্প, দাহ, পিপাসা বা গাত্রোত্তাপ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার কোন উপসর্গই একদিনের তরেও আর দেখা দিবে না। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার বর্দ্ধিত প্লীহা, লিভারও ক্রমেই কমিয়া আসিবে। আপনার শরীরের রক্ত বৃদ্ধি হইতেছে। আপনি ক্রমেই এখন দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকিবেন। আপনার আর জ্বর হইবে না। নিশ্চয়ই আপনার আর জ্বর হইবে না।"

অথবা

শিক্ষার্থী এইরূপ আদেশও দিতে পারেন যথাঃ—"জীবন-বাবু, আজ হইতে ৭ দিনের মধ্যে আপনার ম্যালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আজ হইতেই ম্যালেরিয়ার উপসর্গগুলি যেমন, শীত, তাপ, দাহ, পিপাসা, মাথাব্যথা প্রভৃতি কমিতে থাকিবে। ৭ দিনের মধ্যেই আপনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। আপনার বর্দ্ধিত প্লীহা, লিভার ক্রমেই কমিয়া যাইবে। ৭ দিনের মধ্যে ঐগুলিও আর থাকিবে না। ৭ দিনের মধ্যেই আপনার জ্বর নিশ্চয়ই

আরোগ্য হইবে।"

এই দুই প্রকার আদেশের মধ্যে শিক্ষার্থীকে ২য় প্রকার আদেশ অনুযায়ীই প্রথম প্রথম কার্য্য করা ভাল। যাহারা ২য় প্রকার অনুযায়ী কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং ইচ্ছাশক্তি ও মানসিকশক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাঁহারাই প্রথম প্রকারের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার অধিকারী। যথারীতিভাবে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আদেশ করিতে পারিলে, একবারের আদেশেই রোগী আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। তাহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কদাচই সম্ভব নয়। কিন্তু ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে অভ্যাস করিলে প্রত্যেকের পক্ষেই উহা নিশ্চয় সম্ভব।

কথা এই যে, শিক্ষার্থী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে হইলে, তিনি প্রথমেই দূরস্থ বা বিদেশস্থ রোগীর চিকিৎসায় মনো-নিবেশ না করিয়া, প্রথম প্রথম নিজগৃহে বা নিজের প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন সহজ বা অল্পদিনের রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিবেন। উহাতে কৃতকার্য্য হইলে— অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যারাম আরোগ্যের প্রয়াস পাইতে হয়। এ জগতে সকল কার্য্যই আস্তে আস্তে উন্নতি ভাল এবং উহাই নিয়ম।

আবার, যে রোগ যত কঠিন, জটীল বা পুরাতন—উহা আরোগ্য করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় বা বেশী দিন আদেশ প্রদান করা আবশ্যক।

সাধারণ চিকিৎসা জগতে আমরা যেমন দেখিতে পাই যে, যে সমস্ত রোগী একটু অনুভূতি সম্পন্ন, যাহাকে ইংরাজীতে "সেন্‌সেটিভ্" (Sensative) বলে, উক্ত প্রকারের রোগী খুব কম ঔষধে এবং

অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ—এ ক্ষেত্রেও যাহারা অনুভূতি সম্পন্ন রোগী, অল্পদিনেই—সামান্য আদেশেই তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

উপরে যে, জ্বর রোগী আরোগ্যার্থ আদেশ প্রদানের নমুনা দিলাম—ঐ ভাবে কি শারিরীক, কি মানসিক, কি নৈতিক, যে কোন প্রকারের রোগ আরোগ্যার্থ সেই সেই রোগের অনুকুলানুযায়ী আদেশ প্রস্তুত করিয়া নিতে হয়—। পূর্ব্বেই আদেশ প্রস্তুত করিয়া ঠিক করিয়া রাখিবেন যেন, আদেশ প্রদান কালীন চিন্তা করিয়া আদেশবাক্য প্রদান করিতে না হয়। আদেশ প্রদান কালীন শুধু কেবল রোগী, আদেশবাক্য ও রোগ আরোগ্য এই তিনটী বিষয়ের দিকেই একাগ্র মন থাকিবে। আর একই ব্যক্তির, একাধিক ব্যাধি আরোগ্য করিতে হইলে, একটী আরোগ্য করিয়া তৎপর অন্যটী আরোগ্য করিতে প্রয়াস পাইবে। যেটী বেশী কষ্টদায়ক সেইটীই আগে আরোগ্য করিয়া নিতে হয়। দিনে একবার, রাত্রিতে একবার, ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ এই দুইবার আদেশ প্রদান করিতেই হইবে। এতদ্ব্যতীত যত বেশী বার সক্ষম হইবে, রোগীও ততই সহজে ও অল্প সময়ে আরোগ্য হইবে।

এখন আমরা দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়টী আলোচনা করিব। উহা আর কিছুই নয়, ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, তাঁহারই কৃপায় রোগীকে আরোগ্য করা। এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিময় ভগবান, সকলের অন্তরেই তুল্যভাবে বিরাজিত। তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, বিশ্বাস রাখিয়া, একান্ত মনে রোগ আরোগ্য উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে হয়। সুতরাং ইহাতে

বিশ্বাস, ভক্তি ও একাগ্রতাপূর্ণ প্রার্থনাই সর্ব্বপ্রধান বিষয়। সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতে হয় যে—"হে দয়াময় ঠাকুর, এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা তুমি, তোমার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তের মধ্যে কি না হয়। তুমি দয়া করিয়া (অমুক ব্যক্তির, অমুক রোগ) আরোগ্য করিয়া দাও। আমার একান্ত প্রার্থনা, তোমার চরণে প্রভু! কৃপা কর। রোগটী আরোগ্য করিয়া দাও।" এইভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হইবা অতি কাতর ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়। কিছুদিন ভক্তি সহকারে প্রত্যহ তাঁহার চরণে নিবেদন জানাইলেই, সাধক! নিশ্চয় জানিও, সেই বিপদবারণ, সর্ব্বরোগহারী, জীবের প্রাণের প্রাণ—শ্রীহরি—মধুসূদনের সিংহাসন নড়িয়া উঠিবে। হ্যাঁ, আমাদের মত ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তিও ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার কৃপাবিন্দু লাভ করিতে অবশ্যই সক্ষম। এবিষয় আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকেই পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা উপলব্ধি করুন—ইহাই নিবেদন।

শিক্ষার্থী দূরস্থ রোগীর চেহারা না জানিলে তাহার ফটো সাম্‌নে রাখিয়া—উহাকে জীবন্ত জ্ঞানে কার্য্য করিতে হয়, ঐ বিষয় পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালন

এবার আমরা একটী অতিশয় কঠিন অথচ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিব, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও উহা পালন করা সম্বন্ধে ২।৪টী বিষয় পাঠকবর্গ সমীপে আলোচনা করা অতিশয় আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কেন না, এই ব্রহ্মচর্য্য কি—কাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে? কি ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়—ইহা পালনের সার্থকতা কি—পালন না করাতেই বা কি ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—এসব বিষয় যতই গভীর ভাবে আলোচিত ও মিমাংসিত হইবে ততই আমাদের দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী আবার বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ—স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছি, মনের জোর নাই, প্রাণে সাহস নাই, দেহে ক্ষমতা নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে যদিও পরাধীনতাই ইহার একটী বিশেষ কারণ কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে গেলে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই ইহার সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র মূলীভূত কারণ।

আমরা শৈশব ও বাল্যকাল হইতেই বিদ্যা শিক্ষা করি। প্রথমতঃ আপন গৃহে পিতা মাতা ও বড় ভাই ভগ্নির নিকট, তৎপর বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট এবং বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র আরও কত কি শিক্ষা পাই, এতদ্ব্যতীত বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কত প্রকারের নভেল,

উপন্যাসাদি পাঠ করি, সিনেমা বায়োস্কোপ দেখিয়া কু, সু, কত প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করি—কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় কি পিতা-মাতা, কি জ্যেষ্ঠ ভাই ভগ্নি, কি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রি কেহই ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রটী ত একবারও শিক্ষা দেন না! ফলে আমরা প্রায় পশুবৎ হইয়া পড়িতেছি। বাহ্যিক দৃষ্টতঃ আমরা এক একজন বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া কত বড় বড় চাকুরী করি ও কত অর্থ উপার্জ্জন করি—কিন্তু আমাদের অন্তরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা প্রায় পশুবৎ। অসময়ে অবৈধভাবে কামবৃত্তির অনুশীলন করিয়া, অপরিপক্কাবস্থায় বীর্য্যক্ষরণ করিয়া কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহা ভাবিতে গেলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। ২০ বৎসর চিকিৎসা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া শত শত পরিবারের ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, বি, এ, এম, এ, পাশকরা, উপযুক্ত উপার্জ্জক্ষম পুত্রকে হঠাৎ যক্ষা, উন্মাদ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রমণ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সংসার অচল করিয়া দিয়াছে। কিংবা ঐরূপ উপযুক্ত পুত্রকে পিতামাতা কত আহ্লাদের সহিত একটী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী যুবতীর পানিগ্রহণ করিয়া ঘড়ে আনিয়াছেন—পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়াপ্রতিবেশীর আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু যে চারি চোখের মিলনে আজ এ আনন্দের সৃষ্টি, সেই দম্পতিদ্বয়ের যে কি দুর্দ্দশা, কি অনল তাহাদের অন্তরে জ্বলিতেছে—কি সর্ব্বনাশ তাহাদের ঘটিল তাহা বাহির হইতে কে বুঝিবে? বিবাহের ২।১ বৎসরের মধ্যেই স্বামী, কোনক্ষেত্রে হতভাগিনী স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া অন্তরের জ্বালা হইতে চিরমুক্তি-লাভ করিয়াছেন—এমন ঘটনা বিরল নহে। ইহার কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে অবৈধভাবে, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের ফলে স্বামী সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ বা ইন্দ্রিয় শিথিলতায় উপনীত হওয়ায়, দাম্পত্য সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা নিবৃত্তি করিলেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করতঃ ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন বা নানাপ্রকার ঔষধাদি সেবনে কোন প্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়শক্তিকে একটুও কার্য্যক্ষম করিতে সক্ষম হইয়া ২।১টী সন্তান লাভে কৃতার্থ মনে করেন—তাহারাও ঐ সন্তানাদির দ্বারা সংসারে বিশেষ সুখ শান্তি পান না, তাহার কারণ, ঐ ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য এত খারাপ হয় যে, কোন না কোন প্রকার ব্যাধি উহাদের লাগিয়াই আছে। আজ পেটের অসুখ, কল্য জ্বর, পরশ্ব সর্দ্দি, এ রকম রোগের তাড়নায় জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সন্তানাদি এরূপ রুগ্ন, ক্ষীণাঙ্গ হইবার একমাত্র কারণই পিতামাতার বাল্যবস্থা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের দরুণ, অবৈধ ও অযথা ভাবে অপরিপক্ক বয়স হইতেই শুক্রক্ষয়ের ফলে, শুক্র তরল ও ক্ষীন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সেই ক্ষীণ, নিস্তেজ, বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান কি করিয়া সুদৃঢ় দেহ ও স্বাস্থ্য লাভ করিবে? আবার, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হেতু, যৌবনের উদ্দমকালে, অস্থানে কুস্থানে যাইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার ফলে, পুরুষের নানাপ্রকার যৌনব্যাধি হওয়ার ফলে দেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়া শুক্রধাতুকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই বিষাক্ত শুক্র হইতে উৎপন্ন সন্তান জন্ম হইতেই বিকলাঙ্গ বিকলাস্থি, জন্মান্ধতা, আরও কত কি অস্বাভাবিক জনমপ্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরের

কর্ম্মভোগ ভুগিবার জন্য সংসারে আসিতেছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাই বলি যদি সুদৃঢ়, অটুট ও সবল স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাক্‌তে চান—যদি প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া, সিফিসিষ, প্রভৃতি ধাতুঘটিত ও কুৎসিৎ জঘন্য ব্যাধিগুলি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান—তাহা হইলে প্রত্যেকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন। প্রত্যেক পিতামাতা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রি, সমাজের বা দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট করযোড়ে নিবেদন—শৈশবকাল হইতেই ছেলেমেয়েদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন শিক্ষা দিন।

ব্রহ্মচর্য্য পালন শুনিতে যত কঠিন মনে হয়—কার্য্যতঃ পালন করা তত কঠিন নয়। যদি বাল্যকাল হইতেই আমরা ইহার উপকারিতা, অপকারিতা, আবশ্যকতা ছেলেমেয়েদিগকে হৃদয়াঙ্গম করাইয়া দিতে পারি, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে শুক্রধাতুই দেহের সারবস্তু, এই শুক্রেই দেহের বল, প্রাণের সাহস, চিত্তের প্রফুল্লতা। এই শুক্র রক্ষাই মানব জীবনে উন্নতি লাভের বা ভগবৎ আরাধনার প্রধান অস্ত্র। যদি বাল্যকাল হইতেই আমরা ইহা তাহাদের অন্তরে হৃদয়াঙ্গম করাইয়া দিতে পারি যে, বীর্য্য-রক্ষণই জীবন বা প্রাণ—এবং বীর্য্যক্ষয়ই মৃত্যু। যদি দৃঢ়ভাবে ইহা প্রত্যেক বালক বালিকার অন্তরে বোধগম্য করাইয়া দিতে পারি তবেই উহারা দেহের এই অমূল্য বস্তুটীকে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে যত্নবান থাকিবে। শুধু শিক্ষার অভাবে, শুধু অভিভাবক বা পিতা-মাতার প্রযত্নের অভাবেই দেশের এই বিষয়ে দুরাবস্থা।

অনেক যুবক, যুবতী আমাকে সাক্ষাৎ মতে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন

বা দেশ বিদেশের অনেকে পত্রদ্বারা জানিতে চাহিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন কি ভাবে করা যায়? ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রকৃত অর্থ কি? ইহা পালন করিবার কোন বিশিষ্ট প্রক্রিয়া আছে কি না—ইত্যাদি নানাভাবের প্রশ্ন সংযুক্ত পত্রাদি আমি দেশ বিদেশ হইতে পাইয়া আসিতেছি। তাহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমি অবিলম্বেই দিয়াছি এবং কোন কোন যুবকের নিকট হইতে ধন্যবাদসহ প্রতিউত্তর পাইয়াছি যে,—আমার লিখিত মত উপদেশ পালন করিয়া তাহারা অতি সহজে ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম হইয়াছেন।

শাস্ত্রে আছে "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"

পাতঞ্জলদর্শন।

বীর্য্য ধারণ অর্থাৎ শুক্র রক্ষার নামই ব্রহ্মচর্য্য। দেহস্থ শুক্র ধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা বা অভ্যাসকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে। এই শুক্রই শরীর রক্ষার প্রধান কর্ত্তা। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেও আছে যে,

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জায়ঃ শুক্র সম্ভবঃ॥
শুক্রং সৌমং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥
ওজস্তু তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহ-স্থিতি-নিবন্ধনম্॥"

সুশ্রুতঃ

অর্থাৎ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি

হয়। এই শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক। উহা গর্ভের বীজ স্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান অবলম্বন। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত, সাতটী ধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। যদিও হৃদয়েতেই ইহার প্রধান আধার, তবুও ইহা সর্ব্বদেহ বিস্তার করিয়া আছে এবং ইহাই দেহ রক্ষার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র।

শাস্ত্রে আছে—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
উর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্ররক্ষা বা বীর্য্য ধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতঃ উর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই মানব নামে প্রকৃত দেবতা। যিনি উর্দ্ধরেতা, মৃত্যু তাহার স্বেচ্ছাধীন, বীরত্ব তাহার করায়ত্ব। ইচ্ছা করিলে তিনি, অতি অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিতে পারেন—কারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁহার বশীভূত থাকে, তিনি যাহাই ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বদা অতুলানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

মোট কথা, দেহের সারবস্তু শুক্র ধাতুকে অযথা দেহ হইতে ক্ষরণ হইতে না দেওয়া বা শারিরীক মানসিক কোন প্রকার কর্ম্মদ্বারা দেহের মধ্যে উহার কোন প্রকার চঞ্চলতা উপস্থিত হইতে না দেওয়ার নামই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ॥"

কামবিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন এবং গুহ্যভাষণ অর্থাৎ গোপনে আলোচনা, সঙ্কল্প এবং ঐ ঐ বিষয়ে অধ্যবসায় এবং

অতঃপর ক্রিয়া নিষ্পত্তি—এই সকল কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়—অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা দেহের মধ্যে চঞ্চলতা উপস্থিত করিয়া শুক্র ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিবে। এই হইল শাস্ত্রের কথা! আচ্ছা, এখন ধীরভাবে শুনুন :—

একটী প্রধান কথা এই যে, আমরা যত কিছু কার্য্য করিয়া থাকি—তৎপূর্ব্বে আমাদের অন্তরে অর্থাৎ চিত্তে ঐ ঐ কর্ম্ম বিষয়ক একটী ভাব সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়। কু, সু, যে কোনপ্রকার কার্য্যই আমরা করি না কেন, প্রথমেই ভাবাকারে আমাদের অন্তরে জাগে। এই ভাবই জগৎ, এই ভাবই কর্ম্ম। ইহা অতি স্থূল কথা। প্রত্যেকেই একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, আপনি একটী দরিদ্রকে একটী টাকা দান করিতেছেন। আপনার এই দানকরা রূপ যে কার্য্য, এই কার্য্যের মূলে রহিয়াছে, আপনার দানের প্রবৃত্তি বা মনোভাব। আপনার মনে ভাব হইয়াছে যে, ঐ দরিদ্রকে কিছু দান করেন - তাই আপনি উহাকে ১টী টাকা বা অন্য কিছু দান করিতেছেন। আপনি রসগোল্লা খাইতেছেন। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই খাওয়ার পূর্ব্বে, রসগোল্লা খাওয়ার একটা ইচ্ছা বা ভাব আপনার অন্তরে জাগিয়াছে। আপনি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন, বা গুরুসেবা করিতেছেন, বা সহস্র লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন ইত্যাদি এক প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিতেছেন—তাহা সুকর্ম্মই হউক, আর কু-কর্ম্মই হউক, পরের জন্যই হউক বা নিজ স্বার্থের জন্যই হউক, প্রত্যেক কর্ম্মের পিছনে রহিয়াছে ঐ ঐ কর্ম্ম সংস্কাররূপ

এক একটী ভাব। যেখানে ভাব নাই সেখানে কর্ম্মও নাই। যেমন আমাদের নিদ্রার মধ্যে "সুষুপ্তি" অবস্থাটী। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও ভাব থাকে না সুতরাং নিষ্ক্রিয় ভাবে আরা ঐসময় থাকি। এতদ্ব্যতীত কি জাগ্রতাবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়—আমরা সর্ব্বদাই ভাবের দ্বারা চালিত হইতেছি।

ভাব এবং **ইচ্ছা** এই দুইটী একই কথা। সুতরাং কোন কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে হইলে—ঐ ঐ কর্ম্ম সংস্কাররূপ ভাব বা ইচ্ছা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কিংবা ভাব বা ইচ্ছা জাগা মাত্রই উহাকে দমন করিতে হইবে অথবা ঐ কর্ম্ম সংস্কার রূপ কোন ভাব যেন আদপেই অন্তরে বা চিত্তে উঁকি না মারে এমন কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, তবেই ঐ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা সম্ভব হইবে, অন্যথায় কদাচই পারিবে না। ইহাই হইল আসল কথা।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতে যাইয়া অনেক জ্ঞানী, পণ্ডিত, এমন কি সাধু মহাপুরুষকেও বলিতে শুনিয়াছি একই কথার প্রতিধ্বনি যে, "বীর্য্য রক্ষাকর, অশ্লিল বাক্য শুনিও না, কাম বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিও না, সাত্ত্বিক আহার করিও, অধিক রাত্রি জাগরণ থাকিও না, স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিও না ইত্যাদি ইত্যাদি" সহস্র সহস্র উপদেশ দিয়া শিষ্যের মনোরঞ্জন করিয়া নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন কিন্তু একটুও ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐভাবের উপদেশ আদৌ প্রাকৃটিক্যাল্ (practical) নয়। শত শত যুবকের দুঃখপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্রাবলী হইতেও সারাংশ যাহা পাইয়াছি তাহাও ঐ একই প্রকারের নালিশ যে, উপরোক্ত

ভাবের উপদেশগুলি ব্রহ্মচর্য্য পালনের পক্ষে আদৌ কার্য্যকারী হইতেছে না। দয়া করিয়া কোন সহজ পন্থা থাকিলে তাহাই উপদেশ দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও কাতরতা ব্যঞ্জক পত্র। আমিও অতি সহজ, সরল পন্থা উপদেশ দিয়া মাসেকের মধ্যেই প্রত্যেকের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনে কৃতকার্য্যতারূপ সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে ও আনন্দে বিভোর হইয়াছি।

অনেকের ধারণা, যাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিয়াছেন বা যাহারা অপরিণত বয়স হইতেই অজ্ঞানতা বশতঃ শুক্রক্ষয় করিয়া পাপপথে বিচরণ করিতেছেন—তাহাদের বুঝি আর ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময় নাই বা তাহারা বুঝি আর ব্রহ্মচর্য্য পালনে অধিকারী নয়—। ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক কথা। প্রত্যেকেরই যে কোন সময়, যে কোন বয়সে, যে কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের বা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং যাহারা বিপথ-গামী হইয়াছেন, বা বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন—তাহাদিগকে আমি বারবার আশ্বাস দিয়া বলিতেছি যে, তাহাদেরও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময় বা অধিকার ষোলআনা আছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই উহা পালন করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা বা আগ্রহ পোষণ করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন "যাদৃশীভাবনাযস্য—সিদ্ধির্ভবতীতাদৃশী" ইংরাজীতেও একটী কথা আছে "Where there is a will, there is a way" অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনের ভাব, তাহার কার্য্যের সিদ্ধিও তদ্রূপ। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে, উপায়ের অভাব নাই।

"আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, আমি কখনও অবৈধভাবে শুক্র ক্ষয়করিব না" এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিলে তবেই আপনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। এখন নিম্নে আমি ব্রহ্মচর্য্য পালনের অব্যর্থ কৌশল বা উপায় লিপিবদ্ধ করিলাম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে—ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারী—এই ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বদা মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিবেন যে, "আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, আমি অবৈধভাবে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিব না, নিশ্চয়ই করিব না। আজ হইতে আমি এক বিন্দুও শুক্রক্ষয় করিব না, কোন প্রকার কাম বিষয়ক চিন্তা, ভাবনা মনে অসিতেই দিব না, আমি আজ হইতে বীর্য্যবান্ পুরুষ। আমি আজ হইতে প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে দর্শন করিব। স্ত্রীলোক দেখামাত্র মনে মাতৃভাব ফুটাইব এবং আমার মাকে চিন্তা করিব।" এইভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের মন্ত্রগুলি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে। বড় বড় ২।৪ খানা কাগজে উপরোক্ত মন্ত্রগুলি পরিস্কার ও বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া আপনার শয়নকক্ষে বা পাঠগৃহে এমন স্থানে লাগাইয়া রাখিবেন যেন যখনই আপনি গৃহে প্রবেশ করেন—তখনই ঐ মন্ত্রগুলি আপনার চো'খে পড়ে এবং তখনই আপনি স্থিরভাবে বসিয়া ৫।৭ বার খুব অন্তরের সহিত ঐ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিয়া নিবেন। এখন আপনাকে আর অন্য কিছুই করিতে হইবে না; শুধু মনে প্রাণে ঐ ইচ্ছাশক্তির সাধনা। কোন প্রকারে যদি একবার ঐ ইচ্ছাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন—তবেই আপনি জয়লাভ করিবেন—ইহা সুনিশ্চিত জানিবেন। এ দুনিয়াতে আমরা কু, সু, যে কোন

কার্য্যই করিনা কেন—সমস্তই অভ্যাস। এই অভ্যাস যোগের সাহায্যে, আপনি আপনার অন্তরস্থ ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলুন।

সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, "ব্রহ্মচর্য্য পালন" সর্ব্বপ্রধান সাধনা। সর্ব্বদা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশায় আপনাকে যত্নবান থাকিতে হইবে। যখন বেড়াইতেছেন তখন, যখন শুধু বসিয়া আছেন অথচ অন্য কোন কাজ নাই, যখন শয্যায় শুইতে যাইবেন তখন, যতবার পারেন মনে মনে ঐ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিয়া নিবেন এবং আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে দৃঢ়ভাবে ঐ মন্ত্রগুলি অনুযায়ী ভাব পোষণ করিবেন। যখন রাত্রে নিদ্রা যাইবেন, নিদ্রার পূর্ব্বে যতবার পারেন, বেশ ঐকান্তিকতার সহিত ঐ মন্ত্রগুলি বার বার আবৃত্তি করিবেন—সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য মনে মনে বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন। শয়ন করিয়া বেশ একাগ্রতার সহিত উহা আবৃত্তি করিতে করিতে, এবং মনে মনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া—মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবেন। একটী বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা জানিয়া রাখুন। নিদ্রাকালে খুব ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠার সহিত যাহা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হওয়া যায়—নিদ্রিতাবস্থায় মন তদাকারে আকরিত হয়। ইহা মনোবিজ্ঞানের কথা, অতি সত্য কথা। সুতরাং যদি নিদ্রাকালে বেশ আন্তরিকতার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উহা মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে নিদ্রা যান তবে কিছুদিন পরই দেখিতে পাইবেন, মন উহা মানিয়া লইয়াছে। তখনই ব্রহ্মচর্য্য সাধন খুব সহজ হইয়া পড়ে। তখন আর সাধকের

বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। এ সব নিয়ম শ্রদ্ধা ও মনের ঐকান্তিকতার সহিত পালন করিয়া বহু বিপথগামী যুবক যুবতী ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম হইয়াছেন এবং বিশেষ ভাবে জানি যে তাঁহারা পরে, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী যৌন সমস্যার সমাধান করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। অনেকের ধারণা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে, আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ধারনা।

শাস্ত্রানুযায়ী সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ও সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগে ব্রহ্মচর্য্যের আদৌ হানি হয় না—বরং উহা ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহায়তা করে।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের আর একটী অব্যর্থ কৌশল —ভগবচ্চরণে প্রার্থনা—

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার আর একটী অব্যর্থ কৌশল হইতেছে—একান্ত শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা। ভগবান সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বান্তরযামী অর্থাৎ সকল জীবের অন্তরে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজমান। আমরা যখন যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, দেখি, শুনি, আমাদের অন্তরের বেদনা, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও ভাবের একান্ত সাক্ষিস্বরূপ মঙ্গলময় ভগবান সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে আছেন। আমাদের অন্তরের সুখ দুঃখ সরলভাবে জানাইবার এমন স্থান আর দ্বিতীয় নাই। প্রাণরূপে তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজিত, এবং আমাদের প্রত্যেক কথাটী, প্রত্যেক প্রার্থনাটী শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া

রহিয়াছেন। এস সাধক! এস ব্রহ্মচর্য্য পালনেচ্ছুক ভারত মাতার বীর সন্তান!! একবার আমরা তাঁর চরণে ঝাপাইয়া পড়ি! আমরা ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছি, শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি, শতশত উপদেশ শুনিয়াও জীবনকে ন্যায় পথে পরিচালিত করিতে পারিতেছি না—এতই অক্ষম, এতই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি—তাই আমাদের মনে, প্রাণে, বুকে শক্তির উন্মেষ হওয়ার জন্য এস, আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ দুইবেলা স্থিরভাবে বসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন। বলিবেন "ওগো ঠাকুর, তুমি আমার অন্তরে আছ, আমি বিশ্বাস করি বা নাই করি, তোমায় মানি বা নাই মানি—একথা সত্য যে, তুমি আমাব অন্তরে আছ। আমার প্রাণরূপে সর্ব্বদা তুমি আমার অন্তরে আছ। তুমি দয়া করে, প্রাণরূপে আমার অন্তরে আছ বলিয়াই ত আমার অস্তিত্ব—নইলে, আমার বলতে জগতে আর কি আছে।

হে প্রাণময় ঠাকুর, হে হৃদয়েশ্বর, হে সর্ব্বান্তর্য্যামী, ওগো আমার জনম মরণের সারথী তুমি! আমার একটী নিবেদন—তুমি আমায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের পূর্ণ ইচ্ছা ও শক্তি দেও। আমি যত কিছু অপরাধ করিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর। আর যেন আমি এক মুহূর্ত্তের তরে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হই না। মনে, প্রাণে, বাক্যে সর্ব্বপ্রকারেই যেন আমি সর্ব্বদার তরে ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম হই। ঠাকুর! আমায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের একান্ত ইচ্ছা ও শক্তি দেও। অবৈধভাবে শুক্র ক্ষয়ের প্রবৃত্তি আমার যেন কখনও হয় না!

আমি যেন কখনও কোন নারীকে কামচক্ষে দেখি না। নারী দর্শন মাত্রই যেন আমার অন্তরে মাতৃভাব ফুটিয়া ওঠে! হে ঠাকুর, আমায় কৃপাকর, আমায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম কর।" এইভাবে অতি কাতরতার সহিত, একান্ত চিত্তে কিছুদিন প্রার্থনা করিয়া দেখুন। ইহার ফল যে কি চমৎকার, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে হইবে না। শ্রদ্ধাসহকারে, একান্ত মনে, বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিতে পারিলে ৭।৮ দিনেই আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। শতাধিক বিপথগামী যুবক যুবতী এই প্রার্থনারূপ সুকৌশলটী শিক্ষা পাইয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত আমার বিশেষ ভাবে জানা আছে।

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে একান্ত ইচ্ছুক, তাহারা উপরোক্ত কৌশল ২টী শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিপালন করিবেন। অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন যে, আপনার ব্রহ্মচর্য্য পালনে ক্ষমতা জন্মিতেছে, মনের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে। আসল কথা, মনে বা অন্তরে ভাল হইবার ইচ্ছা না থাকিলে কোন প্রক্রিয়াই কার্য্যকারী হয় না। পবিত্র হইবার দৃঢ় ইচ্ছা লইয়া, এই নিয়মা-নুসারে চলিলে অতি শীঘ্রই আশাতীত ফল পাইবেন। অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজের মানসিক ও নৈতিক স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবেন। অনেকে মনে করেন, সকলেই ব্রহ্মচারী হইলে বা জিতেন্দ্রিয় হইলে গৃহস্থাশ্রম চলিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে হিন্দুশাস্ত্র বলেন "জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবেই বিবাহ করিও—গৃহস্থ হইও।" নতুবা অসংযত মানবের শুক্র হইতে উৎপন্ন সন্তানদ্বারা

সংসারের বা দেশের কোনই মঙ্গল সাধনের আশা নাই। যাহা হউক, একান্ত ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালনে রত হইবেন তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। মনে রাখিবেন ব্রহ্মচর্য্য পালন করা খুব কঠিন কথা নয়—কঠিন কথা শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালনের একান্ত ইচ্ছা পোষণ করা। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি অনুযায়ী কার্য্য করার সঙ্গে নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টী এবং আহার সম্বন্ধেও ২।৪টী বিষয় পালন করিবেন।

১। সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন। এমন কি, মনেও কখনও নারী চিন্তা করিবেন না। যদিই বা কখনও কোন নারীর চিন্তা মনে আসে তখনই নিজ মাতৃমূর্ত্তি ঐ নারী মূর্ত্তির পার্শ্বে বসাইবেন, দেখিবেন, অবিলম্বে আপনার মন পবিত্র হইয়া উঠিবে।

২। বিনাকাজে কখনও থাকিবেন না। অলস ও অতিরিক্ত আহারী ব্যক্তিগণই অধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়। কোন কার্য্য না থাকিলে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবেন। কুচিন্তা উদয় হওয়া মাত্র, উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামজপ, কিংবা ভগবদ্বিষয় গান করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

৩। রাত্রি অধিক না হইতেই নিদ্রা যাইবেন এবং অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবেন। শয়ন করিবার পূর্ব্বে হস্ত পদাদি শীতল জলদ্বারা ধুইয়া শয্যায় শয়ন করিবেন। শুইয়া যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, ততক্ষণ ভগবানকে চিন্তা করিবেন, এবং সৎপথে থাকিবার জন্য বা ব্রহ্মচারী হওয়ার জন্য মনে মনে দৃঢ় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবেন। নিদ্রার পূর্ব্বে এবং শয্যাত্যাগ কালীন ১ গ্লাস শীতল জল পান করিবেন।

৪। কখনও জননেন্দ্রিয়ে হাত দিবেন না। যৌবন বয়সে হঠাৎ এক এক সময় দেখিতে পাইবেন যে, পুরুষাঙ্গ গরম ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, সে সময় খুব সাবধানে থাকিবেন, হুসিয়ার! তখন ভুলেও পুরুষাঙ্গে হাত দিবেন না। তখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইবেন, ঠাণ্ডা জল দ্বারা পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ ও গুহ্যদ্বার উত্তমরূপে ধৌতকরে ফেলবেন।

৫। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং তলপেটে বায়ু জমিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। উত্তেজক এবং গুরুপাক খাদ্য খাইবেন না। ডিম, পিয়াজ, রসুন, মুরগীর মাংস, হাঁসের মাংস বা অন্যকোন পক্ষির মাংস খাইবেন না। মাছ, মাংস ব্রহ্মচারীর না খাওয়াই নিয়ম।

৬। শারীরিক পরিশ্রম ইন্দ্রিয় জয়ের পক্ষে বিশেষ হিতকর। প্রত্যহ কিছু কিছু ব্যায়াম করিবেন এবং মুক্ত বাতাসে দ্রুতপদে ভ্রমন করিবেন।

৭। সর্ব্বদাই পবিত্র থাকিবার ইচ্ছা পোষন করিবেন। "এই দেহ ভগবানের মন্দির" প্রাণরূপে শ্রীভগবান এই দেহ মন্দিরে প্রতিমুহূর্ত্ত বিরাজিত—এই সত্য কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

৮। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন। গল্পচ্ছলেও মিথ্যাকথা ভাল নয়।

৯। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ লাভের চেষ্টা করিবেন। মনে রাখিবেন, মহতের কৃপায় জগাই-মাধাই প্রভৃতি মহা পাপীও উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। কুসংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। অনর্থক বাজে কথা, বাজেগল্প বলিবেন না। কুগ্রন্থ পাঠ, কুচিত্র দর্শন, নারীচিত্র

দর্শন, কুবাক্য, কুসঙ্গীত শ্রবন করিবেন না— এমন কি মৈথুনরত পশু পক্ষী পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না। এককথায়, সর্ব্বদাই কায়মন-বাক্যে সৎ বা সাধু হইবার ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিবেন।

১০। সর্ব্বদাই ভগবানের নামকীর্ত্তনে অভ্যস্ত হইবেন। সর্ব্বদা ভগবানের নামকীর্ত্তনের মত উপাদেয় ও আনন্দকর বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় কিছু নাই। ভগবানের যে নামটী প্রিয় বা শৈশবকাল হইতে ভগবানের যে নামটীতে অভ্যস্ত, সেই নামেই সর্ব্বদা তাহাকে মনেপ্রাণে ডাকিতে অভ্যাস করিবেন। তবে, সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য "গুরু" শব্দটীই সহজ এবং উহা উচ্চারণও সহজ। যখন কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন, তখন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুন, ক্ষতি নাই—কিন্তু যেই মুহুর্ত্তে তাঁহাকে মনে পড়িবে অমনি যেই নামে ইচ্ছা, সেই নামেই প্রাণভরিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইবেন। ইহাতে বিশেষ ফল পাইবেন, প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের পক্ষে, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা - ঋষিদের প্রবর্ত্তিত পন্থানুযায়ী নিষ্পন্ন করিতে পারিলে, দেহের ও মনের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী অতি সহজ প্রণালী প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রার বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। সাধক মাত্রেই এইগুলি নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন তবে একটী কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, যাহাদের কোন প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়া আছে, যেমন হাঁপানী, ক্ষয়কাশি কিংবা হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার ব্যাধি আছে তাহারা প্রাণায়াম বা শ্বাস প্রশ্বাসের কোন প্রক্রিয়া করিতে চেষ্টাই করিবেন না—উহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট হইবে।

১। **শীতলীকুম্ভক**—ইহা প্রথমভাগে "দেহ নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, কান্তিযুক্ত করিবার, আয়ু বৃদ্ধি করিবার, রক্ত পরিষ্কার ও পিত্তশূল আরোগ্যের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল" অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখুন। (৫৬ পৃঃ দেখুন)

২। **শ্বাসমুদ্রা**—(Breathing Exercise) স্থিরভাবে টান হইয়া বসিয়া বা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়, অতি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস (নাকদিয়া) টানিতে থাকিবেন, এবং এক দমভর ঐভাবে নিঃশ্বাস লইয়া ৮।১০ সেকেণ্ড সময় শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিবেন, তৎপর খুব ধীরে ধীরে ঐ নাক দিয়াই শ্বাস ত্যাগ করিবেন। অতি ধীরে ধীরে এই কার্য্য করিতে হইবে এবং শীতলীকুম্ভকের মতই যেন হাঁপাইতে না হয়, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই মুদ্রার বাকী সমস্ত নিয়মই শীতলীকুম্ভকের মত। পার্থক্য এই যে, শীতলীকুম্ভকে বায়ু মুখদ্বারা টানিতে হয়। এই মুদ্রায় উহা আবশ্যক হয় না। এই মুদ্রায় নাক দিয়াই শ্বাস গ্রহণ এবং নাসিকার সাহায্যেই শ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। শীতলীকুম্ভক অধ্যায়টী খুব ভাল মত পাঠ করিয়া এই মুদ্রা সম্পন্ন করিবেন। এই মুদ্রা অভ্যাসে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বক্ষ প্রসারিত হয়, রক্ত পরিষ্কার হয়, দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়, চেহারা সুন্দর হয়। শীতলীকুম্ভক বা শ্বাসমুদ্রা এই উভয়টীরই প্রায় একই প্রকার গুণ, তবে, শীতলীকুম্ভকের একটী বিশেষত্ব এই যে, উহার পিত্তশূল রোগ আরোগ্যের বিশেষ ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত এই দুইটি প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। যখনই কোন কুচিন্তা বা কুভাব মনে উদয় হইবে, বা কুকার্য্যে বা কুদৃশ্যে মন ধাবিত হয়, তখনই পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রক্রিয়াটি

অনুযায়ী কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এই দুইটীকে যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে।

৩। স্থিরভাবে বেশ আরাম মত বসিয়া মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া নিজ শরীর সোজা করিয়া রাখিবেন। অতঃপর, চক্ষুর সোজাসুজি নিকটে একটী সূক্ষ্ম বিন্দু অঙ্কিত করিয়া সেই বিন্দুটীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবার অভ্যাস করিবেন। চোখের পলক না ফেলিয়া, নির্নিমেষ নেত্রে ঐ বিন্দুটীর দিকে চাহিতে অভ্যাস করিবেন। তখন মনে অন্য কোন কিছুই চিন্তা করিবেন না। দৃষ্টি ঐ বিন্দুতে নিবদ্ধ রাখিয়া মনকে অন্য বিষয় হইতে সংযত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ দৃষ্টিও যেমন ঐ বিন্দুতে আবদ্ধ রাখিবেন, মনটীও ঐ বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে. এইভাবে প্রথম প্রথম ৫।৭ মিনিট বসিয়া অভ্যাস করিবেন, পরে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের মাত্রা বাড়াইবেন এবং ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা, অবশেষে একঘণ্টা ঐ ভাবে ঐ বিন্দুতে চক্ষু ও মন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অভ্যাস করিবেন। ইহাতে মনের শক্তি ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। একাগ্রতাশক্তি জন্মিবে, এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হইবে। প্রথম প্রথম কয়েক মিনিট দৃষ্টি নিক্ষেপের পরই চক্ষু জ্বলিতে আরম্ভ করিবে এবং চক্ষুর পাতা নড়িবে। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। প্রত্যহই ঐরূপ করিবেন। বাদ দিলে চলিবে না। প্রথম প্রথম শুধু প্রাতে একবার করিয়া করিলেই হইবে এবং অল্পক্ষণ করিবেন। পরে অভ্যাস হইয়া আসিলে দুপুরেও একবার করিবেন, এবং প্রত্যেক বারই উহা সমাপনের পর চোখে বেশ করিয়া ঠাণ্ডা জলের

ঝাঁপটা দিবেন। এই প্রক্রিয়াটী মনের একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি প্রখর ও তীক্ষ্ণ করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। রাত্রিতে কদাচই ইহা অভ্যাস করিবেন না।

এই পুস্তকের প্রথমভাগে লিখিত ঋষি প্রবর্ত্তিত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করিবেন, তাহা হইলে দেহ মন উভয়ই সুস্থ থাকিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

কখনও পরনিন্দা করিবেন না। পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা এই দুইটী চিত্ত কলুষিত হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। পরনিন্দা বড়ই আনন্দদায়ক, অথচ রহস্য এই যে, পরনিন্দা দ্বারা নিজের চিত্তবৃত্তিই কলুষিত হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি এই যে, যে সময়টুকু বা যতক্ষণ পরনিন্দায় রত থাকিয়া সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়টী বা ততক্ষণ মন ঐ নিন্দিত বিষয়াকারে আকারিত হইয়া ঐ পরনিন্দারূপ ঘৃণিত কার্য্যটা আমাদের দ্বারা করাইয়া থাকে; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ততক্ষণের জন্য আমাদের চিত্ত কলুষিত অবস্থায় ছিল। এ সংসারে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই যেমন দোষ আছে, তেমন প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে নানাপ্রকার সদগুণও নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং দোষে গুণেই মানুষ গঠিত। পরের দোষানুসন্ধান বা পরনিন্দা না করিয়া পরের গুণ অনুসন্ধান কবিবেন। ইহাতে আত্মার প্রসারতা হইবে। যেখানেই দেখিবেন বা জানিবেন যে, পরনিন্দা হইতেছে—তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন।

মনে রাখিবেন, পরের দোষদর্শন বা পরনিন্দা খুব সহজ কাজ, পরন্তু, পরের গুণদর্শন বা গুণকীর্ত্তন বড়ই কঠিন। পরনিন্দা করিতে কাহারও নিকট শিখিতে হয় না বা পুস্তক পাঠ করিয়া পরনিন্দারূপ কার্য্য শিক্ষা হয় না। উহা স্বভাবতঃই আপন হইতেই ফোটে কিন্তু পরের গুণকীর্ত্তন বা গুণ অনুসন্ধান ইহা অভ্যাসদ্বারা করিতে হয়। "কখনও পরনিন্দা করিব না—পরের গুণকীর্ত্তন করিব।" এইরূপ দৃঢ় সংকল্প সর্ব্বদা পোষণ করিবেন।

পরশ্রীকাতরতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অপরের শ্রী দেখিলে সুখ হয়, পরের উন্নতি দেখিলে প্রাণে আনন্দ হয়, অন্যের কোন প্রকার ভাল দেখিলে—নিজের নিকটও ভাল লাগে, এমন লোক সংসারে অতি বিরল। এ কথাটী খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পরের সুখ, শান্তি, উন্নতি দেখিলেই বা শুনিলেই অধিকাংশ মানবেরই আত্মা সংকুচিত হয়। আত্মা প্রসারিত হয় না। এ কথার সত্যতা প্রত্যেকেই নিজে নিজে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন। যিনি অপরের সুখ, উন্নতি দেখিবামাত্র বা শুনিবামাত্র অন্তরে অন্তরে (শুধু মুখে বা বাক্যে নয়) নিজেও সুখী ও আনন্দিত বা আহ্লাদিত হন—তিনিই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য এবং ভগবানের নিকটও তিনি আশীর্ব্বাদলাভ করিয়া থাকেন। পরশ্রী সুখ অর্থাৎ অপরের সুখে সুখী হওয়া, অপরের আনন্দে আনন্দিত হওয়া, পরের উন্নতিতে আহ্লাদিত হওয়া—ইহা অভ্যাসজাত। অভ্যাস যোগেরদ্বারা মনকে ঐরূপ হইতে শিক্ষা দিলেই, কিছুদিন পর উহা স্বভাবে পরিণত হয়। "পরের সুখে সুখী হইব, পরের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত হইব" এরূপ দৃঢ় সংকল্প মনে মনে পোষণ

করিলেই স্বভাবতঃই কিছুদিন পর চিত্তে ঐ সদ্‌গুণের বিকাশ হইবে।

পরিশেষে আর একটী আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমি এই ব্রহ্মচর্য্য পালন অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে (বিবাহিতই হউন বা অবিবাহিত হউন) বা আত্মার উন্নতি বা উর্দ্ধগতি সাধনের পক্ষে নারীজাতির সঙ্গে মিলামিশা, কথাবার্ত্তা, আলাপ-সালাপ আবশ্যক অতিরিক্ত কখনই করিবে না। ইহাদ্বারা নারীজাতিকে ঘৃণা করা হইতেছে এ অর্থ করিবেন না। নারীজাতিকে ঘৃণা করা হইতেছে—তা'নয়। উহাদের আকর্ষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য দূরে থাকা। অনেকে অপর স্ত্রীলোক বা যুবতীদের সঙ্গে কোন প্রকারের আপ্‌না আপ্‌নিভাব দেখাইতে যাইয়া উহাদের সহিত মা, ভগ্নি, দিদি, মাসী, খুড়ি ইত্যাদি নানা-প্রকারের আত্মীয়ভাব-সূচক সম্বন্ধ পাতাইয়া, তাহাদের সঙ্গে অবাধ মিলামিশা করেন বা কথাবার্ত্তা কহেন, গল্প ঠাট্টা করেন। অনেক সংসারে এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দেখিতে বা শুনিতে ইহার মধ্যে বিশেষ কোন দোষধরা পড়ে না কিন্তু একটু সুক্ষ্মদৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই ইহাতে যে একটী গভীর দোষ লুক্কায়িত আছে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

আমিও পূর্ব্বে এই সত্য কখনও জানিতাম না। একবার হিন্দুমহাসভা হইতে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের দেশে হিন্দু-জাতির অবনতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দৈনিক ৪ঘণ্টা করিয়া ৪দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এবং অতিশয় সার-গর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গেই তিনি এই বিষয়টী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন যে, অনেককে দেখা যায়, মা, ভগ্নি কোনরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া বা ঐ ভাবের ডাক ডাকিয়া মেয়েছেলেদের সঙ্গে আসা যাওয়া, কথাবার্ত্তা আলাপ-সালাপ করেন।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহার সঙ্গে কামভাব বিজড়িত আছে। যিনি ঐরকম আলাপে অভ্যস্ত—তিনি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তি তাহার অন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে ঐ নারীদের সঙ্গে মিলামিশা, যাতায়াত করাইতেছে। ঐ শক্তিটাই হইতেছে "কামশক্তি"। কার্য্যতঃ কোন কুকার্য্য বা অন্যায় কার্য্য উহাদের মধ্যে হইতেছে না বটে কিন্তু ঐ আসা যাওয়া, ঐ কথাবার্ত্তা, ঐ অবাধ যাতায়াতের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে পুরুষটীর এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েলোকটীরও কামভাব চরিতার্থ হইতেছে। ইহা যৌন-বিজ্ঞানের কথা (Sexual science) এবং মনস্তত্ত্বের ১টী গুপ্ত রহস্য।

যাহা হউক, পুরুষ মাত্রেরই নারীদের নিকটে প্রকৃত আবশ্যক না থাকিলে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ যৌবনকাল, অতিভীষণ সময়। ঐ সময় কি পুরুষ, কি নারী উভয়কেই খুব সংযতভাবে জীবন কাটাইতে হয়—নতুবা ইহার ফল অতি বিষময় হইয়া থাকে।
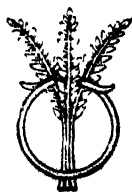
পরিশিষ্ট

স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য গ্রন্থোল্লিখিত যৌগিক নিয়ম, প্রক্রিয়াগুলি পালন করার সঙ্গে, প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টীও অতি অবশ্যই পালন করিবেন ; এমন কি, বালক-বালিকা-দিগকেও এইগুলি শিক্ষা দিবেন। কিছুদিন এই নিয়মে চলিলে, শরীর খুব ভাল থাকিবে।

১। প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর অর্দ্ধসের পরিমাণ শীতল জল পান করিবেন। সর্ব্বপ্রথম ২।৪ বার জলদ্বারা মুখ কুলকুচা করিয়া, তৎপর ঐ শীতল জল পান করিবেন। ইহাকে যোগশাস্ত্রে "উষাপান" কহে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, পায়খানা, প্রস্রাব উভয়ের পক্ষেই ইহা হিতকর। রাত্রেই শয়ন করিবার কালীন ১ গ্লাস জল নিয়া শয্যার পার্শ্বে সাবধান মত ঢাকিয়া রাখিবেন। গ্রন্থের ১ম ভাগে উল্লিখিত প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর "জাগরণ মুদ্রা" সম্পন্ন করিবার পর এই "উষাপান" করিতে হয়।

২। এই গ্রন্থে ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত প্রাতঃকালে কাঁচা হরিদ্রা ও ইক্ষুগুড় খালিপেটে সকলেই খাইতে অভ্যাস করিবেন। ইহার ফল অমৃত স্বরূপ—বহু পরীক্ষিত।

৩। যাহারা তিনবেলা স্নান করিবেন—যদি সর্দ্দির দোষ থাকে তবে, তাহারা প্রাতে বা সন্ধ্যায় (ঠাণ্ডা, বর্ষা বা শীত থাকিলে) স্নানের পরই গা মুছিয়া তৎক্ষণাৎ জামা বা আবশ্যক মত কাপড় গায়ে দিবেন। হয়তঃ স্নানের পর কতক্ষণ হাঁচি হইবে বা নাকদিয়া সর্দ্দি ঝড়িবে—কিন্তু উহাতে ভয় পাইবেন না বা নিয়মিত স্নান বাদ দিবেন না। ধৈর্য্য ধরিয়া যথানিয়মে কয়েক মাস স্নান করিয়া দেখুন—অব্যর্থ ফল পাইবেন।

৪। প্রাতে বা শেষবেলায় প্রত্যহ কিছুক্ষণ ব্যায়াম নিশ্চয়ই করিবেন, ইহাতে কদাচই অবহেলা করিবেন না। তাঁছাড়া সর্ব্বদাই [illegible]কর্ম ও পরিশ্রমের অভ্যাস রাখিবেন, স্বাস্থ্য খুবই ভাল থাকিবে।